হিন্দু

হিন্দু

দিব্যেন্দু পালিত

প্র কা শ ন
৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রকাশক ঃ অমিতা চট্টোপাধ্যায়
আশীর্বাদ প্রকাশন
৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন
কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ৩০ জানুয়ারি ১৯৬০

উপদেষ্টা ঃ
অ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইণ্ডিয়ান স্মল ইণ্ডাস্ট্রি,
বিজনেস অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট

অলংকরণ ঃ গোপাল সান্যাল

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ বিজন কর্মকার

মুদ্রক ঃ অসীমকুমার সাহা
দি প্যারট প্রেস
৭৬/২ বিধান সরণি (ব্লক কে-১)
কলকাতা ৭০০ ০০৬

ঈশানী ও পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-কে

সূচীপত্র

হিন্দু

প্রতিদিনের মতো আজও ভোরবেলায় গঙ্গাস্নান সেরে দ্রুত হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন মথুরানাথ। খালি পা, পরনে ধুতি, গায়ে নামাবলী, কপালে তিলক, হাতে তামার পাত্রে গঙ্গাজল। সুগৌর পায়ের পাতায় জল শুকিয়ে গেলেও মাটি লেগে আছে এখনো। মুখে অস্ফুট গীতার শ্লোক। প্রতিদিনের এই নৈষ্ঠিকতা শীতে বাতাসের ছোবল থেকে বাঁচায় তাঁকে, গ্রীষ্মে হয়ে ওঠে ক্লান্তিহর। নিতান্তই অসুস্থ না হয়ে পড়লে গত তিরিশ বছরে এই অভ্যাসে ছেদ পড়েনি কখনো।

দশ বারো বছর আগে ভোরের স্নানযাত্রায় সঙ্গী পেতেন কাউকে কাউকে। তাঁদের কেউ মারা গেছেন, কেউ অথর্ব, কেউ বা রামপুর ছেড়ে চলে গেছেন অন্যত্র। শেষ সঙ্গী বানোয়ারিলাল মারা যাবার পর এখন তিনি একা। নতুন কেউ আসেনি। মথুরানাথ জানেন দিনকাল পাল্টে গেছে, আরো পাল্টে যাচ্ছে ক্রমশ। শুদ্ধাচার বিনষ্ট হবার মুখে। মানুষ এখন ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করে, রাজনীতি করে ; কিন্তু ধার্মিকতা মানে না। এই যে এখন একা একাই গঙ্গাস্নান করতে যান তিনি—একাই স্পর্শ করেন প্রত্যুষের নদীজল, এসব সময়ে এক বিচিত্র উপলব্ধি স্পর্শ করে যায় তাঁকে। মনে হয় তিনি যেমন গঙ্গার, তেমনি প্রতি ভোরে গঙ্গাও অপেক্ষায় থাকেন তাঁর—তাঁকে সংস্পর্শ দেবার জন্যে থেমে থাকেন কিছুক্ষণ। তিনি যখন থাকবেন না তখন নদী অন্যমনস্ক হবে।

দশ বারো বছর আগে অবশ্য নদী এতটা দূরে সরে যায়নি। তখন মাইল দুয়েক দূরে খঞ্জপুর ঘাটে গেলেই হতো। মূল স্রোত ক্রমশ বাঁক বদল করতে শুরু করায় চড়া পড়তে শুরু করে খঞ্জপুরে। নদী আর নদী থাকেনি। পাঁক, আগাছা আর সর্ষে গাছের মধ্যে দিয়ে ক্ষীণ যে জলধারা এখন বহে যায় তাতে পায়ের পাতা ভেজে না। সুতরাং যেতে হয় অনেকটা দূরের পীরপুর ঘাটে—গঙ্গা যেখানে আজও নদী, বেশ চওড়া ও গভীর, সারাক্ষণ টলটল করে জলের গতিতে।

বাষট্টি বছরের মথুরানাথ পাণ্ডের এই খেয়াল পছন্দ করে না তাঁর বাড়ির লোকজন—স্ত্রী কৌশল্যা, মেয়ে বিন্দিয়া, ছেলে বিপিন এবং পুত্রবধূ নীতা। এমনকি কাজের লোক গয়ারাম, লছমিও। দিনকাল খারাপ। ইদানীং কোথাও তেমন কিছু না ঘটলেও গত দাঙ্গার পর থেকে একটা চাপা আশঙ্কা যে ছুঁয়ে থাকে রামপুর ও তার আশ-পাশের মানুষজনকে, কেউই একা হতে চায় না – সেটা কে না বোঝে!

মথুরানাথের ছেলে বিপিন আইন পাশ করেছে পাটনা থেকে। প্র্যাকটিস করে পাটনা, রামপুর দুই জায়গাতেই। ভোর রাতে উঠে বুড়ো বাপের গঙ্গাস্নানে যাওয়া নিয়ে মা কৌশল্যার অনুযোগ শুনে কিছু দিন আগে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টায় বলেছিল, 'বাবুজি, সুবহ ঘর মে আস্নান করনেসে আপকা ধরম ঝুটা হো জায়গা কেয়া? বুঢ়াপে মে কুছ শোচ বিচার চিন্তা আনা চাহিয়ে। আখির হামলোগোঁ কী ওর ভি তো দেখিয়ে! মা কিতনা রোতী হ্যায়।'

শুনে হেসেছিলেন মথুরানাথ। যেমন হাসেন, স্বচ্ছন্দে।

'দেখো বেটা, মেরে লিয়ে চিন্তা নেহি করো। ধরমকা চিন্তা মনুষ্যকো অপনী অপনী হোতী হ্যায়। যেইসে তুমারা আঁখে দিখাতা হ্যায় ম্যয় তুমারা পিতা হুঁ—ঔর মে দেখতে হুঁ তুম মেরা পুত্র হ্যায়। ম্যয় হিন্দু হুঁ—অগর মেরা আত্মা শুদ্ধ রহে, বিশওয়াস ঠিক রহে, তো মেরা কাজকাম ভি ঠিকই রহেগা। লাগাতার তিশ বাত্তিস সাল আস্নান মে গিয়া, লৌট ভি তো আয়া অবতক! কুছ অনিষ্ট তো নেহি হুয়া!'

'আপকা বাত সহি হ্যায়।' বিপিন বলেছিল, 'লেকিন অচানক কুছ হো যায় তো! অনিষ্ট আশমান সে হি ঝুঁকতা হ্যায়—'

'পরন্তু ইয়ে অনিষ্টকে বাত ভি নেহি হ্যায়। ছেলেকে এইভাবে আশ্বস্ত করে স্বভাববশত গীতা থেকে উচ্চারণ করেছিলেন মথুরানাথ, 'ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ।' বেফিকির রহো।'

মথুরানাথের চাপে পড়ে একদা সংস্কৃতচর্চা করার সময় গীতা পড়েছিল বিপিন, সে জানে এই শ্লোকাংশের অর্থ কী। মথুরানাথ কর্মফলে বিশ্বাস করেন না, গার্হস্থ্য জীবনযাপন করলেও সন্ন্যাসীর শুভচারিতা তাঁর রক্তে—মোক্ষলাভের প্রত্যাশা নেই। জ্ঞান হবার পর

থেকেই বিপিন দেখেছে মানুষটা ধার্মিক, ন্যায় অন্যায় মানেন, শ্রদ্ধা করেন নিজের হিন্দুত্ব ও পৈতেকে। এ অঞ্চলের হিন্দু, মুসলমান, অন্ত্যজ সব মানুষই চেনে তাঁকে, সম্মান করে। আগে যখন চারদিকে সব মানুষের মধ্যে সদ্ভাব, সম্প্রীতি ছিল তখন বহু লোক আসত তাঁর কাছে। ঘনিষ্ঠরা বসত, সরবত খেত, কথা শুনত তাঁর। এখন কানহাইয়ালালজি, দয়াচরণ মিশ্র, জানকীনাথ চৌধুরী এবং এমনই প্রবীণ দু'চারজন ছাড়া নিয়মিত আসেন না কেউ। নতুনদের সঙ্গে বয়সের ব্যবধান, রুচির ব্যবধান, একটু-আধটু ভাষারও ব্যবধান। তবে সম্ধানটা পান।

বাপকে নিয়ে বিপিনের চিন্তার কারণও ও-ই, বয়স। আগের মতো সরল, সমর্থ নেই। ঠিকঠাক অ্যাটাক না হলেও বছর তিনেক হার্টের অসুখে ভুগেছিলেন বেশ কিছুদিন। চিনচিনে ব্যথা হতো বুকে বাঁ হাতে। চিকিৎসা করাতে হয়েছিল পাটনায় নিয়ে গিয়ে। ডাক্তার স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে বললেও বেশি পরিশ্রম করতে মানা করেছিল। কে শোনে! রোজ ভোরে এই গঙ্গাস্নান করতে যাওয়া এবং ফিরে আসাটাকে মথুরানাথ নিজে স্বাভাবিক মনে করলেও অন্যরা করে না। একা একা যাতায়াত, সাঁতার জানেন না—কোনো-দিন হঠাৎ কিছু ঘটলে টেরই পাবে না কেউ। অন্য ধরনের ভয় ছাড়াও রাস্তাঘাট খারাপ, যখন বেরোন তখন ঘুটঘুট করে অন্ধকার। হোঁচট খেতে পারেন, বা পাটনা, মোকামা, ভাগলপুর, সাহেবগঞ্জ থেকে আসা যাওয়া করে যেসব লরি আর ট্রাক, অসাবধানে চাপাও পড়তে পারেন সেগুলোর কোনোটায়।

ওদের আশঙ্কায় ভুল নেই কোনো। কোতোয়ালিতে তাদের বাড়ি থেকে পীরপুর ঘাটের দূরত্ব কম নয়। এদিক ওদিক পাঁচ ক্রোশ তো বটেই। এতটা রাস্তা পায়ে হেঁটে কেউই পার হয় না আজকাল। দরকার পড়ে না। রামপুরের যে অংশটুকু শহর হতে হতেও পুরো-পুরি হয়ে ওঠেনি এখনো, তার একদিকে কোতোয়ালি থানা, রেলস্টেশন, হনুমান মন্দির, বাজার; অন্যদিকে পোস্টাপিস, হাসপাতাল, রামমন্দির আর কাছারি—মোটামুটি দেড় দু মাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারও বসতি মাঝখানে যত ঘন আশপাশে তা নয়।

রামপুরের ওপর দিয়ে বিহার স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাস যায় এক দেড়-ঘণ্টা অন্তর, শহরের মধ্যে সাইকেল চলে, সাইকেল রিকশা আছে বেশ কয়েকটা, মোটর আছে দু' চারজনের। আর বাহন বলতে ঘোড়ায় টানা একা আর গরুর গাড়ি। সেগুলি যাতায়াত করে রামপুরের আগের বসতি নাথচৌক থেকে পরের বসতি ছান্দোরি পর্যন্ত। বাকি পথের খবর রামপুরের মানুষ রাখে না। বছর দুয়েক আগে দাঙ্গার পর থেকে এটা হিন্দুদেরই জায়গা। আগে কংগ্রেসের দাপট ছিল, এখন বিধানসভা নির্বাচনে অধিকাংশ ভোট দেয় বি জে পি-কে। যে কয়েক ঘর মুসলমান অবশিষ্ট ছিল তারা আস্তে আস্তে সরে গেছে ছান্দোরির দিকে। ওদিক থেকেও কিছু হিন্দু চলে এসেছে এদিকে। নিতান্তই দায়ে না পড়লে এখন কেউই আর এদিক ওদিক করে না।

প্রায় পাঁচ মাইল রাস্তা হেঁটে এসে মথুরানাথ যখন বাড়ির কাছা-কাছি তখন আর ভোর নেই, সূর্য উঠে গেছে, নরম রোদ ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে চারদিকে। পথ হাঁটার পরিশ্রমে ঘাম ফুটেছে তাঁর কপালে। ঘাম অনুভব করছেন নামাবলীর নীচে, পিঠে ও বুকে। গরম পড়তে শুরু করেছে, দুপুরের দিকে ছোটখাটো ধুলোর ঝড় বয় মাঝে মাঝে। এরপর বাড়িতে পেঁছে দরজার শিকল নাড়লেই দরজা খুলবে। বেশির ভাগ দিনই ছুটে আসে মেয়ে বিন্দিয়া কিংবা পুত্রবধূ নীতা, যে সেদিন রজস্বলা নয়। গঙ্গাজলের পাত্রটি হাতে নিয়ে পেঁছে দেয় পুজোর ঘরে। নিঃশ্বাস সহজ করে তারপর উঠোনের টিউবওয়েলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন মথুরানাথ। অনুগত দয়ারাম জল পাম্প করলে সেই জলে পা ধোবেন তিনি, আচমন করবেন। গা থেকে নামাবলী খুলে পরিষ্কার গামছায় গা হাত পা মুছে চলে যাবেন পুজোর ঘরে। মিনিট দশেক চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকবেন শ্বেত পাথরের রাম ও কৃষ্ণের মূর্তির সামনে। বেলপাতায় গঙ্গাজল ও চন্দন নিয়ে ছিটোবেন তাঁদের পায়ের কাছে, দু' এক ফোঁটা জল মুখে ঠেকিয়ে উঠে পড়বেন। এখন তাঁর বারান্দার খাটিয়ায় গিয়ে বসবার সময়। পিতলের গ্লাসে ঠাণ্ডা দুধ নিয়ে আসবে কৌশল্যা। খাবেন। তারপরই ক্রমশ মিশে যাবেন গার্হস্থ্য জীবনে।

কিন্তু, প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় বাধা পড়ল আজ।

মথুরানাথ লক্ষ করলেন প্রায় তাঁদের বাড়ির কাছে বড় বটগাছটার সামনে জটলা করছে সাত-আটজন লোক। একজন দাঁড়িয়ে আছে সাইকেল নিয়ে। আর কিছু দেখবার আগেই দ্রুত এগিয়ে আসা সুলতানগঞ্জ-ছান্দোর বাসের ধুলোয় দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলো তাঁর। বাসটা চলে যেতে জটলার সামনে এসে থেমে দাঁড়ালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজ পড়ল কপালে।

অল্প চওড়া পিচের রাস্তার পাশে ধুলোয় পড়ে আছে একটা উলঙ্গ লোক। দেখে মনে হয় মাঝবয়সী। কোমরে ময়লা ফিতের গিঁট বাঁধা ; কিন্তু সেটার সঙ্গে জড়ানো পাজামাটা ছিঁড়ে খসে যেতে যেতে এমন আকার ধারণ করেছে যে শরীর আড়াল হয় না। গায়ে জামার মতো একটা কিছু আছে বটে, কিন্তু সেটাও এমনই ছিন্ন যে, বাঁ হাতের ওপর দিকে একটা অংশ লটকে থেকে বাকিটা চলে গেছে লম্বালম্বি শুয়ে থাকা শরীরের নীচে। ছিন্ন কাপড় এবং নগ্ন শরীর, সমস্ত কাদা মাখা। যেন পাশের নর্দমায় শুয়ে ছিল বেহুঁশ হয়ে, সেখান থেকে তুলে এনে কেউ শুইয়ে দিয়ে গেছে রাস্তায়। এমনও হতে পারে লোকটা নিজেই যাচ্ছিল কোথাও—এগোতে পারেনি।

সেজন্যে নয়। লোকটা চোখে পড়ছে অন্য কারণে। মুখের খানিকটা ও শরীরের কিছু অংশ বাদে তার গোটা শরীরে ঘা। মাথায়, গলায়, বুকে, হাতে কোমরে, তলপেটের নীচে, হাঁটু ও পায়ের পাতা, ঘা সর্বত্র। কোনোটা আকারে ছোট, কোনোটা শুকোতে গিয়েও শুকোয়নি, কোনোটা চামড়া উঠে, পুঁজ জমে বেশ দগদগে। বিশেষত অণ্ডকোষ ও লিঙ্গের যা চেহারা, চোখ খুলে দেখা যায় না।

অভিজ্ঞ মথুরানাথ চোখ ফেরালেন না তবু। খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেন লোকটার ডান চোখ পুরোপুরি বন্ধ থাকলেও বাঁ চোখ সামান্য খোলা। এভাবে অচেতন শুয়ে থাকা সত্ত্বেও লোকটা যে মরে যায়নি তা বোঝা যায় তার গর্তে ঢোকা পেট, পাঁজরা বেরুনো বুক ও কণ্ঠনালীর ওঠানামা দেখে ; মুখ ও গায়ের ঘায়ে মাছি বসলে হঠাৎ কখনো কেঁপে ওঠা দেখে।

মথুরানাথকে দেখে সেখানে জড়ো হওয়া লোকগুলির আলোচনা থেমে গিয়েছিল। পথ-চলতি আরো দু' একজন এসে দাঁড়িয়েছে

ইতিমধ্যে। সামান্য ঝুঁকে দেখা অবস্থা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন মথুরানাথ। এই রাস্তা দিয়েই ভোরে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন তিনি, তখন চোখে পড়েনি। তারপরেই তাঁর মনে হলো কৃষ্ণপক্ষ চলছে, যে-সময় তিনি গিয়েছিলেন তখন চারদিকে ঘন অন্ধকার, নিজেকেই হাঁটতে হয়েছিল সাবধানে। এমনও হতে পারে, দেহটা তখনো এইভাবেই পড়েছিল এখানে।

আশপাশের লোকগুলির মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে মথুরানাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কব সে গিরা হ্যায় ইহাঁ পর ?'

'কেয়া মালুম, পণ্ডিতজি।' একজন বলল, 'হম তো ব্যস আভি-আভি দেখা !'

আর একজন বলল, 'বিচারা ! করিব মরনে বালা হ্যায়।'

'এইসে মত্ বোলো, বাবুয়া।' দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বললেন মথুরানাথ, 'শ্বাস ঠিক হ্যায়। জীবিত হ্যায়। আভি আসপাতাল মে লে যানা চাহিয়ে—বাঁচ যায় গা—'

তখন প্রায় সকলেই মাথা নাড়ল গুঞ্জন তুলে।

যে-যুবকটি সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবার তার দিকে তাকালেন মথুরানাথ।

'কী নাম ছে ?'

'জি, গিরধারি।'

'তো এইসে করো গিরধারি বাবুয়া, পুলিশ চৌকি মে যা কর বোলো এক বেহুঁস মরিজ গিরা হুয়া হ্যায় ইধর—জেরা আসপাতাল বন্দোবস্ত্ করে—'

'জি, মায় তো স্টিশন যায়েঙ্গে। ট্রেন প্যাকাড়না হ্যায়—'

'একহি তো রাস্তা—বাস খবরহি না দেনা হ্যায় ! দো মিনিট কা বাত। যাও বেটা, ফুর্তি সে যাও।'

সাইকেল নিয়ে গিরিধারী চলে যাবার পর খানিক অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলেন মথুরানাথ। লোকটাকে দেখলেন আবার। রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে মাছির সংখ্যা। সাধারণ মাছির সঙ্গে একটা দুটো নীল ডুমো মাছিও চোখে পড়ল। ডান চোখের পাতায়, ঠোঁটের পাশে, বুক, হাত, পেট, অণ্ডকোষ—এখন

তাদের বিচরণ সর্বত্র। মুহূর্তের জন্যে শরীরটা কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল আবার, ঠোঁট দুটো ফাক হতে হতেও হলো না। লোকটা কি পিপাসার্ত ? কণ্ঠনালীর স্থিরতা দেখে সেরকম কিছু অনুমান করা গেল না।

গাঢ় নিঃশ্বাস পড়ল মথুরানাথের। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলেন যেন। হে রাম, হে কৃষ্ণ, মুমূর্ষুর এই নিয়তি সজীব মানুষকে দেখতে হয় কেন! চারদিকে এত মানুষের মধ্যে এই হতভাগ্যের কি কেউই নেই, যে ওর নিজের! এভাবে পড়ে থেকে কোন শান্তি পাবে! তারপর ভাবলেন, তাঁর নাম বললে চৌক থেকে নিশ্চয়ই ছুটে আসবে পুলিশ, গরুর গাড়ি বা মাল-টানা রিকশা যাতেই হোক তুলে, একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে যাবে হাসপাতালে। আশা করা যাক হয় সুস্থ হবে, না হয় মৃত্যুই গ্রহণ করবে ওকে। জীবন এর বাইরে চলে না।

এরপর বাড়িতে ফিরলেও মনটা বিমর্ষ হয়ে থাকল মথুরানাথের। অন্যদিন বাড়ি ফিরে যা যা করেন ও যেভাবে, আজও সেইসব সেইভাবে করেলেও চিড় খেল একাগ্রতা। টিউবকলের সামনে দাঁড়িয়ে শুদ্ধ গামছায় হাত পা মুছতে মুছতে দয়ারামকে বললেন, 'শুনো জি, রাস্তা মে বড়ে পেড় কে পাশ এক বেহুঁস আদমি গিরা হুয়া হ্যায়। পুলিশ চৌকিমে খবর ভেজা গিয়া আসপাতাল লে যানেকে লিয়ে। যাও, দেখো জেরা। অগর উসে পিয়াস লাগা হ্যায় তো হাল্‌কাসে এক দো বুন্দ্ পানি দে না মুমে। আভি আভি যানা।'

দয়ারাম মথুরানাথের অনুগত, কখনো অবাধ্য হয় না। তবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন জাত হ্যায়, মালিক ?'

মথুরানাথ চলেই যাচ্ছিলেন, ফিরে দাঁড়ালেন। সামান্য বিরক্তি ফুটল কোমল মুখে।

'মরিজকে ভি জাত হোতা হ্যায় কেয়া! এক বেচারা মনুষ্য—উসে পানি পিলানা ধর্‌ম হ্যায়।'

খড়ম ঠুকতে ঠুকতে পুজোর ঘরের দিকে চলে গেলেন মথুরানাথ। ধ্যানস্থ হতে।

জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে কৌতূহল আছে রামপুরের মানুষের, কিন্তু

আগ্রহ নেই কোনো। সেই দাঙ্গার সময় চারদিনে দু'পক্ষ মিলিয়ে তেত্রিশটা লাশ পড়ার পর এবং আঠারো জন জখম হবার পর একটু ভয় ভাবনা আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, তারপর আবার যে-কে-সেই। কলেরা কি ধরা-না-পড়া অন্য কোনো অসুখে, কি ফোতা ভগন্দর সেপটিক হয়ে, বা নিতান্তই বার্ধক্যজনিত রোগে নিয়মিত কিছু মানুষ না মরলে 'রাম নাম সত্ হ্যায়' ধ্বনি ভুলে যাবে লোকে, যেন সেই-জন্যেই মানুষের মৃত্যু হয় এখানে। উদ্বেগহীন সহজে। জমি বা রাণ্ডি নিয়েও খুনোখুনি হয়, তবে ক্বচিৎ। রামজি ভরোসা।

পুলিশ কাজে দম পায় না--- চোরের চুরির বখরা নেয়, গা ডলায় পা টেপায় তাকে দিয়ে, জল তোলায় কুয়ো থেকে, বেগড়বাই না করলে ছেড়ে দেয় দু'দিন পরে। দাঙ্গার প্রথম দু'দিনেই খুন হয়েছিল ঊনত্রিশ জন, পাটনা থেকে রিজার্ভ পুলিশ এসে অবস্থা সামাল দিয়েছিল, সেই থেকে কাজ না করার ব্যাপারে তারা আরো নিশ্চিন্ত।

হাসপাতালও তেমনি। সুপারিনটেনডেন্ট ডাক্তারের সাইকেলের টায়ার পাংচার হলে সেটা না সারানো পর্যন্ত গালাগালি দেয় সরকারকে, তখন তার ও তার অ্যাসিস্ট্যান্টের ফুরসত হয় না রোগী দেখার। যে কুড়ি বাইশটা বেড আছে সেগুলো রোগীর চিকিৎসার জন্যে যত না, তার চেয়ে বেশি শুয়ে থাকার জন্যে। ডাগদারবাবুর আত্মীয়স্বজন এলে এবং কোয়ার্টার্সে জায়গা অকুলান হলে হাসপাতালের দু' একটা বেড খালি করে শুতে পাঠানো হয় তাদের। ছোটখাটো অসুখের চিকিৎসা হয় বটে, কিন্তু কেস একটু জটিল মনে হলেই চোখ বন্ধ করে চালান কেটে দেওয়া হয় ভাগলপুরে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে।

পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে খাটিয়ায় বসে দুধ খেতে খেতে দয়ারামের খোঁজ করলেন মথুরানাথ। সে এসে খবর দিল লোকটার মুখে কয়েক ফোঁটা জল সে দিয়েছে বটে, কিন্তু তার বেশিটাই গড়িয়ে পড়েছে দু' ঠোঁটের পাশ দিয়ে। মুখে নেয়নি। বলল, গিরিধারী জানিয়ে গেছে পুলিশের আসতে দেরি হবে।

'কিঁউ ?' চিন্তিত দৃষ্টিতে প্রশ্ন করলেন মথুরানাথ।

'কেয়া মালুম, মালিক।' দয়ারাম বলল, 'এইসেহি বোলা। উয়ো

হাবিলদার সাব কো বহুৎ টাট্টি হো রহা হ্যায় কাল রাতসে। চৌকিমে পুলিশ কম ছে।'

'হুঁ।' দু' পাশে দু' হাত ছড়ানো, কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকলেন মথুরানাথ। তারপর বললেন, 'কেয়া দেখা তুম? উয়ো জিন্দা হ্যায় না?'

'জি, মালিক। জিন্দা তো হ্যায়। এইসে লাগা কি মুণ্ডি ভি হিলায়া। ঔর—'

'ঔর কেয়া?'

'জি, উয়ো খৈনিবালা রঘুনাথ কহা, আপ ঘর আনেকে বাদ পিসাব ভি কিয়া। ঔর লোগ ভি কহা।'

দয়ারামের কথায় চিন্তা বাড়ল মথুরানাথের। মুখে জল নিল না, অথচ বলছে পেচ্ছাপ করেছে। সমস্তই লোকটার সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থা প্রতিপন্ন করে। যেটা আরো ভয়ের, যে-ধরনের ঘায়ে সর্বাঙ্গ ছেয়ে গেছে লোকটার, তার ওপর ক্রমাগত মাছি বসলে, রাস্তার ধুলো পড়লে রোগ আরো জাঁকাবে। এসব শরীরের ভিতরের আরো বিষাক্ত কোনো অসুখের প্রভাব কি না কে বলবে! দয়ারামের কথা শুনে মনে হলো বেশ কিছু লোক ভিড় করে আছে ওখানে। কী দেখছে ওরা – এরকম ধুঁকতে ধুঁকতে কখন মরে যায় অপরিচিত মানুষটা! এভাবে কি মরতে দেওয়া যায় মানুষকে!

বিপিন নেই এখানে। মামলা লড়তে গেছে পাটনায়, আজ কালের মধ্যেই ফেরার কথা। ও থাকলে পরামর্শ করে একটা উপায় বের করা যেত। তাহলে কি জানকীনাথ চৌধুরীকে খবর দেবেন? রামপুরের এম এল এ-র ঘনিষ্ঠ, জানকীনাথ ইচ্ছে করলেই একটা ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু সে থাকে নাথচৌকের দিকে—বিকেলে যদিও নিজের গাড়ি চড়ে রোজই আসে এদিকে, ঢুঁ মেরে যায়, এখন অতটা দূরে কে খবর দেবে তাকে! গয়ারামকে দিয়ে খবর পাঠালেও জানকীনাথ যে বাড়িতেই থাকবে তার নিশ্চয়তা কি?

একটা অধৈর্য ভাব দেখা দিল মথুরানাথের মধ্যে। ঘাম এলো শরীরে! খাটিয়ার ওপর পড়ে থাকা হাতপাখাটা তুলে নাড়তে গিয়েও নাড়লেন না। হঠাৎ চেঁচিয়ে মেয়েকে ডাকলেন, 'বিন্দিয়া—ও

বিন্দিরা—

বিন্দিরা স্নানঘরে! পিছনের বাগানে ভিজে কাপড় মেলতে গেছে নীতা। জাঁতায় কলাই পিষছে লছমি। বস্তা থেকে কুলোয় কলাই বের করতে করতে স্বামীর ব্যস্ত হাঁকডাক শুনে নিজেই বেরিয়ে এলো কৌশল্যা।

'কেয়া বাত হ্যায়? কুছ্ চাহিয়ে কেয়া?'

দরজার পাশে দাঁড়ানো স্ত্রীকে দেখতে দেখতে চিন্তাটা গুছিয়ে নিলেন মথুরানাথ।

'দুগো রুপেয়া জেরা লা দেও। দয়ারাম কো আসপাতাল ভেজনা হ্যায়—রিকশামে যায়গা—'

'আসপাতাল!'

'হাঁ। বাহার পেড়কে পাশ এক বেহুঁস মরিজ গিরা হুয়া হ্যায়। আখির কোই তো খয়াল করে গা!'

ঘটনাটা লছমির মুখে আগেই শুনেছে ওরা। স্বামীকে চেনে, সুতরাং কথা না বাড়িয়ে টাকা আনতে ভিতরে গেল কৌশল্যা।

দয়ারামকে হাসপাতালে খবর দিতে পাঠিয়ে ফতুয়া চড়িয়ে, কাঁধে গামছা নিয়ে নিজেও রাস্তায় বেরিয়ে এলেন মথুরানাথ।

অন্তত জন কুড়ি বিভিন্ন লোক তখনো জড়ো হয়ে আছে ওখানে। তাদের মধ্যে দিয়ে ঝুঁকে, গনগনে রোদের মধ্যে সেই ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে সর্বাঙ্গে কম্পন অনুভব করলেন মথুরানাথ। সেই একই ভঙ্গি; কিন্তু অসংখ্য মাছিতে ছেয়ে গেছে লোকটা। বিশেষত বুক ও অণ্ডকোষের দগদগে জায়গাগুলো যেন মৌমাছির চাক, মাছিতে প্রায় ঢেকে ফেলেছে ক্ষতগুলো। জমে আছে, উড়ছে, আবার এসে বসছে। মাছি চোখের পাতায়, পাঁজরের খাঁজে খাঁজে, ঠোঁটের ওপর। ওরই মধ্যে চোখে পড়ল বুকের অল্প ওঠানামা। দেখতে দেখতে চোখের পাতা ভিজে এলো মথুরানাথের। ওইভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই কাঁধের গামছাটা টেনে নিয়ে ব্যস্ত হলেন মাছি তাড়াতে।

গামছার হাওয়ার ঝাপটায় মাছিগুলো ওড়াউড়ি শুরু করতে ছোঁয়া বাঁচানোর ভয়ে তাড়াহুড়ো করে পিছিয়ে গেল লোকগুলো। মনে হলো আরাম পেয়ে লোকটা কেঁপে উঠল একটু। মাথাটাও কাত

করল সামান্য।

মথুরানাথ উঠে দাঁড়াতে ভিড়ের মধ্যে থেকেই একটি লোক মন্তব্য করল, 'অব তো ফিন আপকো গঙ্গা মে জানে পড়ে গা, পণ্ডিতজি!'

'কিঁউ!'

মথুরানাথকে বিরক্ত দেখে যে মন্তব্য করেছিল সে ভয়ে ভয়ে বলল, 'দেখিয়ে না, অব পুরা মাছ্‌ছি তো আপহি কা বদন মে গিয়া! রাম জানে কোন জাত!'

কথাটা ঠিকই। মথুরানাথ লক্ষ করলেন উড়ে যাওয়া মাছির অনেকগুলোই এখন এসে বসেছে তাঁর ফতুয়া ও ধুতিতে। আবার যাচ্ছে লোকটার গায়ে। কোনো জবাব না দিয়ে থমথমে মুখে বাড়ির দিকে এগোলেন তিনি।

হাসপাতালে পাঠিয়ে কাজ হয়নি। দরারাম ফিরে এসে বলল, 'ডাগদারবাবু আভি নহি আয়া, মালিক। ডেপটিবাবু ভিতর থা, ভেট নেহি হুয়া। উয়ো চৌকিদার কহা কি, আনেসে খবর দেগা—'

মথুরানাথ জবাব দিলেন না। মুখটা আরো একটু চিন্তিত হয়ে উঠল শুধু। নিঃশ্বাস পড়ল ঘন হয়ে।

এরপরেই একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন মথুরানাথ। বাড়ির মেয়েদের ডাকলেন। গয়ারামের ঘরের পাশের ঘরটা খালি পড়ে আছে। ঘরটা ঝেঁটিয়ে দিক লছমি। খাটিয়া পাতুক। লোকটাকে রাস্তা থেকে ঘরে নিয়ে আসবেন তিনি।

মৃদু আপত্তি তুলল কৌশল্যা।

'শুনিয়ে জি, আপ ব্রাহ্মণ হ্যায়—'

অন্যরকম দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন মথুরানাথ।

'অগর মনুষ্যকে সেবা ব্রাহ্মণকে কাম নেহি হ্যায় তো আজ সে ম্যায় শূদ্র বনেঙ্গে।'

এ কথায় হকচকিয়ে গেল সকলে। মথুরানাথের এমন মূর্তি, এমন চোখমুখ কেউ দেখেনি আগে। যেটা আরো আশ্চর্যের, হঠাৎই এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তাঁর চোখের কোল বেয়ে। বিষণ্ণ হাতের উল্টোপিঠে সেটা মুছে নিয়ে তিনি উচ্চারণ করলেন, 'হে রাম, হে কৃষ্ণ!'

নীতা কৌশল্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বিন্দিয়া বলল, 'আপকা বিচার সহি হ্যায়, বাবুজি। আখির উয়ো তো এক মরিজই হ্যায়। যাও দয়ারাম, বাবুজিকে সাথ যাও। ময় ইধর বন্দোবস্ত্ করতি হুঁ।'

অনুগত দয়ারাম, দ্বিধা থাকলেও নিঃশব্দে অনুসরণ করল মথুরানাথকে।

রামপুরের মানুষ এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি আগে। ঘেয়ো, অচৈতন্য, জাতপাত না-জানা একটি রাস্তার মানুষকে বুকে কোলে করে বাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে দু'জন মানুষ। তাদের একজন কি না মথুরানাথ!

দৃশ্যটা দেখে কেউ ভয় পেল, কেউ নাক কোঁচকালো ঘৃণায়। সংখ্যায় অল্প হলেও, মাথাও নাড়ল কেউ কেউ। খবরটা চাউর হয়ে গেল চারদিকে।

লোকটাকে বাড়িতে এনে, খাটিয়ার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে স্বস্তি বোধ করলেন মথুরানাথ। তিনি চিকিৎসক নন, কিন্তু শুশ্রূষা জানেন। ক্ষতস্থানগুলো সাবধানে মুছে বাটা চন্দনের প্রলেপ দিলেন সেখানে। জ্বরের হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিলেন; তারপর চামচে করে দুধ খাওয়ালেন যতটা পারেন। স্নেহের হাত বোলালেন মাথায়। লোকটার উলঙ্গ দেহের ওপর ঢাকা পড়ল পরিষ্কার চাদরের। নাকের কাছে হাত এনে অনুভব করলেন নিঃশ্বাস সহজ হয়েছে অনেকটা। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে টিউবকলের জলে স্নান করতে গেলেন তিনি।

দুপুরে আর এক দফা ওষুধ আর দুধ খাইয়ে মনে হলো কিছুটা তেজ এসেছে লোকটার শরীরে। তখন নিশ্চিন্তে ঘুমোতে গেলেন তিনি।

বিকেলে কানহাইয়ালালজি, জানকীনাথরা এসে সব দেখেশুনে মাথা নাড়ল। যে যাই বলুক, কাজটা ঠিকই করেছেন মথুরানাথ। রামপুরের পুলিশ আর হাসপাতাল নিয়ে কিছু করা দরকার, বললেন জানকীনাথ। এমন অব্যবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। যাক, লোকটার জ্ঞান ফিরুক, তারপর তিনি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

বিপিন ফিরল সন্ধের পরে। মামলায় জিতে খুশি; কিন্তু, মথুরানাথের কাণ্ড দেখে খুশি হয়েছে মনে হলো না। প্রায় ঠাট্টার

গলায় বলল, 'ইয়ে তো করিব মহাত্মাজি কো কাম হো গিয়া! ইয়ে সন্দেশ রাষ্ট্রপতিকে পাস যানা চাহিয়ে—'

ছেলের মুখে এমন কথা আশা করেননি মথুরানাথ। ব্যথিত চিত্তে হাসলেন তিনি।

'তো তুম মেরা পুত্র নেহি হো!'

'আপ গলদ সমঝ রহে হে, বাবুজি। ময় আপহি কা পুত্র হুঁ। লেকিন রামপুরকে আম জনতা আপকা পুত্র নেহি হ্যায়। অগর হোতা তো পিছলে বালা দাঙ্গা নেহি হোতা।'

মথুরানাথ চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। আত্মবিশ্বাসে ঋজু গলায় বললেন, 'সায়দ—। লেকিন মেরা ধরম্ মুঝে হি পালন করনে হোগা।'

পরের দিন ভোরে যথারীতি গঙ্গাস্নানে গেলেন মথুরানাথ। ফিরেও এলেন।

কিন্তু বাড়ির কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। গতকাল যেমন দেখেছিলেন তেমনি, দেখলেন বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে বাড়ির সামনে। সকালের রোদ তখন উজ্জ্বল হচ্ছে ক্রমশ। সেই আলোয়, দেখলেন, একটা মোটরও দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। চেনা লাগল। কী ব্যাপার, বুঝলেন না। কিছুটা বিস্মিত, কিছুটা চিন্তিত হয়ে ধীর পায়ে বাড়ি ফিরলেন তিনি। যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা কিছুই বলল না।

খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে অবাক হলেন মথুরানাথ। জানকীনাথ কথা বলছেন বিপিন আর বিন্দিয়ার সঙ্গে। তাঁকে দেখেই ওরা চুপ করে গেল।

'কেয়া বাত হ্যায়! জানকীনাথজি আপ? ইতনা সুবহ!'

গঙ্গাজলের পাত্রটি মথুরানাথের হাত থেকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল বিন্দিয়া।

'জি। আনেহি পড়া।' জানকীনাথ তাকালেন বিপিনের দিকে, 'তুম বোলো, বিপিন। আপ বৈঠিয়ে না, পণ্ডিতজি।'

মথুরানাথ বসলেন না। সন্দেহের চোখে তাকালেন বিপিনের দিকে।

'বাবুজি—' ইতস্তত করে বলল বিপিন, 'উয়ো আদমিকো আভি হটানা হোগা ঘরসে—'

'কিঁউ!'

'কারণ, উয়ো মুসলমান হ্যায়।'

স্তম্ভিত চোখে বিপিনের মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থাকলেন মথুরানাথ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কেয়া উয়ো হোঁস মে আয়া হ্যায়?'

'জি নেহি।' জানকীনাথ বলল, 'লেকিন সারে ওর লোগ এইসে হি কহ রহা হ্যায়। উয়ো নাঙ্গা থা—বদনমে পহচান ভি থা—'

মথুরানাথের মুখে কথা ফুটল না।

'ইয়ে সচ্ হ্যায়, বাবুজি।' বিপিন বলল, 'কাল রাত দয়ারাম বোলা থা হমকো—বেহুঁস মে উয়ো মরিজ "হায় আল্লা" বোলা—'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সচেতন হলেন মথুরানাথ।

'ঠিক হ্যায়। লেকিন—, উয়ো এক বেহুঁস মনুষ্য ভি তো হ্যায়। আভি আরাম হোনে দেও, ফির চলা যায়গা। মেরা ধরম এইসে হি কহতা হ্যায়।'

'আপকা ধর্ম আপহি কো রহনে দিজিয়ে, পণ্ডিতজি।' কঠিন গলায় এবার বলল জানকীনাথ, 'সিচুয়েশন কুছ খারাপ লাগতা হ্যায়। কেয়া আপ রামপুরকো নেহি জানতে হেঁ! কেয়া আপ চাহতে হেঁ কি ইধর হামলা শুরু হো যায়—ফির এক রায়ট লাগে?'

তখন স্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ল ঘরে।

জানকীনাথ বলল, 'উয়ো মরিজকো বন্দোবস্ত্ ম্যয় হি করুঙ্গা। আপকো কোই হানি নেহি হোগা। আপ আরাম কিজিয়ে, পুজাপাঠ কিজিয়ে। ইয়ে ছোটিসি বাত হ্যায়।'

সম্ভবত তা-ই। সামান্য ঘটনা এটা। তবু বড় একটা নিঃশ্বাস সংবরণ করলেন মথুরানাথ। অদ্ভুত শারীরিক অস্বস্তিতে ঘোর লাগল তাঁর। কান গরম, জ্বালা করে উঠল চোখের কোণদুটো। নামাবলীর ভিতর দিয়ে পৈতে স্পর্শ করে শিথিল ঠোঁট নেড়ে নিঃশব্দে উচ্চারণ করলেন তিনি, 'হে রাম! হে কৃষ্ণ!'

তার পরের ঘটনাগুলো ঘটল খুবই স্বাভাবিকভাবে। মথুরানাথ

পা ধুলেন, গা মুছলেন, পুজোর ঘরে গেলেন, দুধও খেলেন। কোনো প্রশ্ন করলেন না কাউকে। যেন একটু আগেকার অভিজ্ঞতা ভুলে গেছেন তিনি, যেন প্রতিদিনের মতো আজও আরো একটা দিনমাত্র। রোদ আছে, হাওয়াও আছে ; সবই প্রকৃতিস্থ। সামান্য গাম্ভীর্য আর অন্যমনস্কতা ছাড়া আর কোনো ভাবান্তর ঘটল না তাঁর।

কৌশল্যাকে চিন্তিত দেখে বিপিন বলল, 'বাবুজি আপনা ধরম পালন কিয়া, বাকি যো সব ঔর লোগ কিয়া। ব্যস, এহি তো হুয়া! কেয়া বাবুজি ভি নেহি সমঝতে হেঁ ইয়ে সব!'

কৌশল্যা ভাবলেন, হয়তো। বিশেষ কোনো পরিবর্তন তো তিনিও লক্ষ করছেন না মথুরানাথের মধ্যে।

পরদিন ভোরের অন্ধকারে প্রতিদিনের মতো গঙ্গাস্নানে বেরুলেন মথুরানাথ।

আর ফিরলেন না।

খবরটা রটনা হতে দেরি হলো না। বিপিন, দয়ারাম-সহ গোটা রামপুরের মথুরানাথের পরিচিত সব মানুষ ছুটল পীরপুর ঘাটের দিকে। দেখল একটু বা ঢেউয়ের আলোড়ন তুলে ধীর গতিতে বহে চলেছে গঙ্গা। গভীর টলটলে তার জলে তীরের মানুষের প্রতি কোনো মনস্কতা নেই।

কোথায় চলে গেলেন মথুরানাথ, কীভাবে গেলেন, কেউই জানতে পারল না তা। ক'দিন অপেক্ষা করার পরেও তাঁর দেহ ভেসে উঠল না কোথাও। তখন লোকে বলাবলি করল, প্রকৃত হিন্দু এই মানুষটির ধর্মাচরণে ভুল ছিল না এতটুকু। গঙ্গাই আশ্রয় দিয়েছে তাঁকে।

কথাটা মনে ধরেছিল জানকীনাথ ও রামপুরের অন্যান্য নামি মানুষের। নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে, এম এল এ-কে ধরে পীরপুর ঘাটের নাম পাল্টে দিল তারা। ঘাটের ভাঙা সিঁড়িগুলো বাঁধানো হলো নতুন করে। বড় বোর্ড পড়ল—'মথুরানাথ ঘাট'। তার নীচে ছোট কিন্তু স্পষ্ট অক্ষরে 'কেবল হিন্দুয়ো কে লিয়ে'। সংক্ষিপ্ত করার জন্যে কেউ কেউ অবশ্য ওই ঘাটকে হিন্দুঘাট-ও বলত।

১৩৯৯

মাদার টেরেসার জন্ম ও মৃত্যু

কথা বলার জন্যে মুখ খোলার পরেও শব্দে পৌঁছতে সময় লাগে পুতুলের। ওই সময়টা ওর বুকের ব্যস্ত ওঠানামা লক্ষ করে বোঝা যায় জায়গা খুঁজছে নিঃশ্বাস। পরিশ্রমের ভিতর কতটা কষ্ট কতটা অভ্যাস বোঝা যায় না ঠিক। তবে মুখের রং পাল্টানো দেখে অনুমান করা যায় প্রক্রিয়াটা সহজ নয়। কষ্টই পাচ্ছে।

এখনো সেইরকম হলো। মাথাটা বালিশ থেকে অল্প তুলে কপালে হাত রাখা রমার মুখটা একটুখানি দেখে পায়ের কাছে বসা মুকুন্দর দিকে তাকাল পুতুল। নিঃশ্বাস পেয়ে ডাকল, 'বাবা—'

'কী, মা ?'

সামান্য ঝুঁকে এলো মুকুন্দ। জানে, এখন আবার কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হবে। ছড়ানো নিজেকে জড়ো করে আস্তে আস্তে কথায় ফিরবে পুতুল।

'নার্সিংহোম আর হাসপাতাল কি একই জায়গা ?'

'হ্যাঁ। একই। দু' জায়গাতেই অসুখ সারিয়ে দেয়।'

পুতুল চোখ বন্ধ করল। হয়তো ক্লান্তি, হয়তো পরের কথাটা বলার আগে দুর্বলতা কাটিয়ে নিচ্ছে। ট্রেনে ওঠা থেকে এ পর্যন্ত যাত্রায় কখনো কম কখনো বেশি হয়ে দুলুনি দিচ্ছে গতি। ঘুমও পেতে পারে। তার ওপর ডাক্তারের নির্দেশ মেনে কাল সন্ধে থেকেই কোনো ঘন খাবার দেওয়া হয়নি ওকে। ক্যাপসুল আর গ্লুকোজের জল কতটা আর চাঙ্গা রাখবে।

আট বছরের মেয়ের মুখ থেকে চোখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকাল মুকুন্দ। স্বামীর সঙ্গে চোখাচোখি হতে জানলার দিকে মুখ ফেরাল রমা ডান হাত মেয়ের কপালে, বাঁ হাতে বড় ফিডিং বটলে গ্লুকোজ ধরা। দ্রুত ছুটতে ছুটতে সাতটা কুড়ির ট্রেন যেসব দৃশ্য দেখাচ্ছে রমার কাছে তা পুরনো। তার চেয়ে বেশি পুরনো স্বামীর মুখ ও অভিব্যক্তি। সম্ভবত সেই জন্যেই পুরনো বাড়ি, টি-ভির অ্যান্টেনা,

বিক্ষিপ্ত গাছগাছালি ও দূরের আকাশ দেখায় মনোযোগী হলো সে। ভাদ্রের শেষ। নীলের পরিচ্ছন্ন ব্যাপ্তিতে থমকে আছে সাদা টুকরো টুকরো মেঘ। শুধু ট্রেনটাই যাচ্ছে।

পুতুল আবার কথা বলবে। আস্তে আস্তে হাত তুলে কপালে রাখা রমার হাতটা স্পর্শ করে বলল, 'আমি কি ওখানে একাই থাকব ?'

'কেন, মা! আমরাও তো যাচ্ছি। আমি, মা—আমরাও থাকব। তুমি কি কখনো একা থেকেছ ?'

পুতুল মাথা নাড়ল।

কোলের ওপর রাখা মেয়ের ন্যাড়া পা দুটোয় হাত বোলাতে বোলাতে চকিত হলো মুকুন্দ। এভাবে হাঁ করছে কেন পুতুল, কেন হঠাৎ জিব দেখা যাচ্ছে ওর ? বুকটা কি ওর পক্ষে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ওঠানামা করছে ? তাহলে কি—

না। তা নয়। আটকে থাকা নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দিল মুকুন্দ।

শুকনো ঠোঁটে পাতলা হাসির রেখা ফুটেও ফুটল না। পুতুল বলল, 'যখন বাড়ি ফিরব—তোমাদের মতো বসেই—'

শেষ করল না কথাটা। খুকখুকে কাশির জের থামিয়ে দিল ওকে। ফ্যাকাশে মুখে আবার ছড়িয়ে পড়েছে রক্তের আভা।

মেয়ের মুখের ওপর ত্রাসে ঝুঁকে এসেছিল রমা। ক্রমশ স্থিরতা পেয়ে বলল, 'তুই এত কথা বলিস না, পুতুল। দেখছিস তো কাশি আসছে!'

বাধ্য ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল পুতুল।

'তেষ্টা পাচ্ছে ? একটু গ্লুকোজ খাবি ?'

যেভাবে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এলো তাতে মনে হয় ঘুমোচ্ছে। মাথা দুলিয়ে না বলল।

'তাহলে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর। কলকাতায় পেঁছিতে এখনো অনেক দেরি।'

মুকুন্দ ঘড়ি দেখল। রমা 'অনেক' শব্দটায় জোর দিলেও সত্যি-সত্যিই কতটা আর দেরি! এরই মধ্যে পেরিয়ে এসেছে কুড়ি মিনিট। সব ঠিকঠাক চললে সাড়ে আটটা নাগাদ শিয়ালদায় পেঁছিবে তারা। তারপর মেয়েকে কাঁধে ও রমাকে পাশে নিয়ে প্ল্যাটফর্মটুকু পেরিয়ে

ট্যাক্সিতে ওঠা। ওখান থেকে আলিপুরে নার্সিংহোমে পৌঁছুতে আধঘন্টা পঁয়ত্রিশ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। হিসেবমতো দেরি নেই, কিন্তু মাঝখানের এই পঞ্চাশ পঞ্চান্ন মিনিট পুতুলের পক্ষে অনেকটা, জেগে থাকলেই তো কথা বলতে চাইবে! রমা ঠিকই বলেছে। বরং ও ঘুমোক।

এভাবে ভাবলেও নিশ্চিন্ত হতে পারল না মুকুন্দ। হঠাৎ দেখল, একহাতে মেয়ের চুলে বিলি কাটতে কাটতে অন্য হাতে আঁচল তুলে নিঃশব্দে চোখ চাপা দিয়েছে রমা—মুখ এখনো বাইরের দিকে ফেরানো, কিছু দেখছে না যদিও। ওকে কি বলবে, এটা ট্রেন, তেমন ভিড় না থাকলেও তাদের অসুস্থ মেয়েকে জায়গা ছেড়ে আশপাশে বসে ও দাঁড়িয়ে আছে, কথা বললেও বলছে নিচু গলায়, তারা সবাই তাকিয়ে আছে তাদেরই দিকে। এখানে বিচলিত হওয়া শোভা পায় না। তা ছাড়া পুতুল এখনো জীবিত, নিঃশ্বাস ফেলছে, কথাও বলছে মাঝে মাঝে। ডাক্তার যা বলেছেন—অপারেশনের পর যখন ওর হার্টের গোলমালটা সেরে যাবে, তখন ওর বয়সের আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠবে পুতুল। নিঃশ্বাসের অভাবে হাঁটতে গিয়ে বসে পড়বে না। স্কুলে যাবে আবার। ছুটবে, খেলবে। সেই আরোগ্যের দিকেই যাচ্ছে ওরা। তা সত্ত্বেও কেন এমন উতলা হয়ে পড়ছে রমা ?

বলবে ভেবেও কথাগুলো বলতে পারল না মুকুন্দ। নৈঃশব্দ্য ছড়িয়ে পড়ল গলায়। কিছু বা জ্বালা নিয়ে বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে তার নিজেরও চোখ। পাছে কেউ লক্ষ করে এই ভেবে মুখ নিচু করল সে। মুকুন্দ জানে না, এই মুহূর্তে কোন আবেগ কাজ করছে রমার বোধের মধ্যে। হয়তো এমন কোনো অসহায়তা, রমা নিজেও যা বুঝতে পারছে না। কাল সারারাত জেগে কাটিয়েছে ও। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেতে মুকুন্দ লক্ষ করেছিল, আট বছরের পুতুলের ঘুমন্ত মুখটা এমনভাবে ধরে রেখেছে বুকের কাছে, যেন দুধ দিচ্ছে চার মাসের শিশুকে। ডাক্তার নয়, ওষুধ নয়—আজ ভোরেও চান-টান করে অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসেছিল পুজোর জায়গায়। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মুকুন্দ বুঝতে

পেরেছিল পুজোটা অজুহাত, আসলে একান্ত খুঁজছে রমা। মা'র স্বভাবে স্ত্রী থাকে না, সুতরাং স্বামীও থাকবে না। ইত্যাদি ভেবে মুকুন্দ যখন এখনকার মতোই আড়াল খুঁজছে, এদিক ওদিক ঘুরে এসে রমা হঠাৎ বলল, 'তোমার মনে আছে, পুতু জন্মাবার পর আড়াইদিন ওরা ওকে আমার কাছে দেয়নি! আলাদা ঘরে রেখেছিল?'

এটা ঘটনা। রমার মনে থাকলে মুকুন্দরও থাকবে। তবু, জবাব দিতে হলো।

'নিঃশ্বাসের কষ্ট তখনো ছিল। ইনটেনসিভে রেখেছিল। ক্রাইসিস কেটে যাবার পর দিয়ে যায়।'

রমা স্মৃতিতে দাঁড়িয়ে। অন্যরকম গলায় বলল, 'যদি একবারেই না দিত, তাহলে আমি ভুলে যেতাম। তখনো তো ওর মুখ দেখিনি, হাত পা দেখিনি। গায়ের গন্ধ পাইনি। তখনো তো— ।'

কথাটা শেষ করল না রমা। পুতুলের কাছেই গেল। আট বছরে ক্রমশ চিনে ফেলা মুখ, হাত, পাগুলো দেখবে নতুন করে। গন্ধও খুঁজবে হয়তো।

মেয়েকে ঘিরে ওর অস্থিরতা লক্ষ করে চিন্তিত হয়েছিল মুকুন্দ। শেষ পর্যন্ত রমাই না সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তখন জোর দিয়ে বলেছিল, 'জন্ম থেকেই ভুগছে। এতদিনে একটা পাকা ব্যবস্থার দিকে যাচ্ছি। ও ভালো হয়ে যাবে ভেবেই তো তোমার শক্ত হওয়া উচিত!'

রমা কী ভাবল কে জানে! পুতুলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার আগেই বলল, 'শক্তই তো আছি।'

স্ত্রীকে শক্ত হবার পরামর্শ দিয়ে এখন তার নিজের চোখই বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে কেন!

নিজেকে সংযত করার চেষ্টায় সোজা হয়ে বসল মুকুন্দ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শিয়ালদায় পৌঁছে যাবে তারা। তারপর নার্সিংহোমে। দশটায় সময় দিয়েছেন ডাক্তার ব্যানার্জি। তার আগে পৌঁছলেও অসুবিধে নেই। সঙ্গে আছে অ্যাডমিশনের চিঠি আর সমস্ত রিপোর্ট। পুতুল ভর্তি হয়ে যাবে। মুকুন্দ-রমার জন্মভোগা মেয়ে নয়, তখন সে পরিপূর্ণ রোগী। আজই কি অপারেশন হবে

ওর ? নাকি কাল ? মুকুন্দ জানে না। শুধু এটুকু জানে, আজ ও কালের মধ্যে ব্যবধান মাত্র কয়েক ঘণ্টার। পরশু যখন ওকে শেষবার দেখেন ডাক্তার, বলেছিলেন, 'সবই ঠিক আছে। তবে কি জানেন, এই ধরনের পেসেন্টের ক্ষেত্রে অনেক সময় সাডেনলি কিছু ঘটে যায়। রিস্ক্ নিয়ে দরকার কী! এসব অপারেশন আজকাল আকছার হচ্ছে। তাড়াতাড়ি করাই ভালো।'

মুকুন্দ রিস্ক্ নেয়নি। দেরি করবে না ভেবে আগে থেকেই তৈরি করেছে নিজেকে। যতভাবে সম্ভব। এমনও হতে পারে, আরোগ্যের সম্ভাবনাটাকে সে যেভাবে আঁকড়ে ধরেছে রমা সেভাবে পারেনি—সেইজন্যেই আশঙ্কায় জড়িয়ে যাচ্ছে আবেগ। ওকে বুঝিয়ে লাভ নেই। এখন নিজেকেই শক্ত হতে হবে।

পুতুল বোধহয় ঘুমিয়েই পড়ল। চোখ থেকে আঁচল নামিয়ে তখন আবার বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে রমা। মুকুন্দ একটা সিগারেট ধরাবে ভেবেও ধরাল না। পকেটে লবঙ্গ খুঁজে, মুখে দিয়ে, অনেকক্ষণের মধ্যে এই প্রথম যেন কিছুই হয়নি ভঙ্গিতে চোখ রাখল অন্য যাত্রীদের মুখের ওপর।

সামনের সিটে যে তিনজন বসে, তাদের একজন ঢুলছে, একজনের মুখ খবরের কাগজে ঢাকা। তৃতীয় ব্যক্তি প্রৌঢ়, তাকেই দেখছে। ট্রেনে ওঠার সময়েই জেনেছিল অসুস্থ মেয়ের চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় যাচ্ছে ওরা ; অনেক চেষ্টা করেও একটা অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করতে পারেনি। মুকুন্দর সঙ্গে চোখাচোখি হতে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'রোগটা কী ?'

কথায় না গিয়ে হাত লাগিয়ে নিজের বুকের বাঁদিক দেখাল মুকুন্দ।

প্রৌঢ় বলল, 'হার্ট উইক ? দেখেই বোঝা যাচ্ছে অবশ্য। লাং ঠিক আছে তো ?'

মুকুন্দ চুপ করে থাকল।

পরের প্রশ্নটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলো।

'আলিপুর যাবেন বলছিলেন। ক্যালকাটা হসপিটাল ?'

'না। উডল্যান্ড্—'

'বাব্বা !' বিস্ময়ে, কিংবা অন্য কোনো কারণে, সামনে ঝুঁকে থাকা অবস্থা থেকে পিছনে হেলান দিয়ে বসল প্রৌঢ়। আগের কথার জের কাটাতে যতটা সময় লাগে ততক্ষণ সোজাসুজি লক্ষ করল মুকুন্দকে। তারপর বলল, 'ওখানে তো মাদার টেরেসাও রয়েছেন—হার্ট অ্যাটাক—'

জবাব না দিয়ে নিরপেক্ষ হবার চেষ্টা করল মুকুন্দ। যে ঘটনা সকলেই জানে তা নিয়ে মাথা নাড়ার দরকার নেই। শিয়ালদায় পেঁছে হারিয়ে যাবে লোকটা। কিন্তু পুতুল থাকবে, সে এবং রমাও থাকবে। তাদের উদ্বেগের হেরফের হবে না একটুকু। কথা বাড়িয়ে লাভ কী!

'আজ তো প্রধানমন্ত্রীও যাবেন ওই নার্সিংহোমে—।' যে-খবরের কাগজ পড়ছিল, কাগজের আড়াল থেকে মুখ বের করে সে বলল, 'কাগজে লিখেছে—মাদার টেরেসাকে দেখতে—'

তিনদিন খবরের কাগজ পড়েনি মুকুন্দ। এই নতুন খবরটা, সুতরাং, জানবার কথা নয় তার। জেনেও কি কিছু হবে! ভদ্রতা-বশত সে শুধু বলল, 'যাবেন হয়তো—আমি জানি না।'

একটু আগে পর্যন্ত যে-স্তব্ধতা ছড়িয়ে ছিল তাদের আশপাশে, মুহূর্তে ভেঙে গেল তা। মুকুন্দর কোলের ওপর রাখা পুতুলের পা দুটো নড়ে উঠল হঠাৎ। অন্য যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে খেয়াল করেনি কখন ও চোখ খুলেছে আবার। সম্ভবত একটু আগেকার কথাবার্তাও কানে গেছে ওর। মুকুন্দর সঙ্গে চোখাচোখি হতে হাঁ করল। রং পাল্টাচ্ছে মুখের। শব্দে পেঁছে বলল, 'বাবা, তুমি বলেছিলে ওই নার্সিংহোমে মাদার টেরেসাও আছে—'

'আছেন তো!' বিব্রত গলায় মুকুন্দ বলল, 'শুনছ না, ওঁরাও বলছেন!'

পুতুল মাথা দোলাল। ক' মুহূর্ত থেমে থেকে বলল, 'মাদার কি সত্যিই আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন?'

'হ্যাঁ, খুকু।' মুকুন্দর জবাবের অপেক্ষা না করে উৎসাহিত প্রৌঢ় বলল, 'তোমাকে কত আদর করবেন—তুমি ভালো হয়ে যাবে—'

'আমি জানি।' প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করল

পুতুল। স্বভাবে সময় নিয়ে বলল, 'বড় হয়ে আমিও মাদার টেরেসার মতো—'

'আঃ! তুই চুপ কর, পুতুল!' মেয়েকে থামিয়ে দিয়ে মুকুন্দকে লক্ষ করে রমা হঠাৎ বলল, 'ওকে এত কথা বলাচ্ছ কেন!'

'ভালো লাগলে বলুক না!' অপ্রস্তুত হয়ে মুকুন্দ বলল, 'আর তো কিছুক্ষণ—'

মুকুন্দ যা বলতে চেয়েছিল রমা তা বুঝল না। অদ্ভুত শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। অবস্থা সামাল দেবার জন্যে ব্যস্ত হাতে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে মুকুন্দ বলল, 'তোর কষ্ট হচ্ছে, পুতুল। তুই এবার ঘুমো।'

আবার নৈঃশব্দ্যে ফিরে এলো ওরা।

আর কিছুর অভাবে মুকুন্দ নিজেও এখন চোখ ফেরাল বাইরে। নির্দিষ্ট কিছুই না দেখে ভাবল, রমা হঠাৎ থামিয়ে না দিলে কথাটা শেষ করত পুতুল। অপারেশন ছাড়া ওর ভালো হবার সম্ভাবনা নেই—ডাক্তার এ কথা বলার পর থেকে সে নিজে যেমন তৈরি হয়েছে তেমনি আস্তে আস্তে তৈরি করছে পুতুল আর রমাকে। রমা চুপচাপ হয়ে গেলেও সমস্যা হয়নি। কিন্তু পুতুল কিছুতেই হাসপাতালে যাবে না। মেয়ের কান্নাকাটি দেখে অসহায় গলায় রমা বলেছিল, 'জোর করলে শরীর আরো খারাপ হবে। যেমন আছে থাক না!' চট করে উত্তর খুঁজে পায়নি মুকুন্দ। পরে, প্রায় স্বগতোক্তির ধরনে বলেছিল, 'থাক বললেই থাকবে!'

পরের দায়িত্বটা নিজেই নেয় মুকুন্দ। পুতুলকে যেসব কথা বলে ক্রমশ অপারেশন টেবিলের দিকে নিয়ে যায় সে, তার সঙ্গে জুড়ে দেয় মাদার টেরেসাকেও। তাতেই কাজ হলো। স্কুলে দিদিমণির কাছে মাদারের গল্প শুনেছে পুতুল। মুকুন্দকেও শুনতে হলো সেই গল্প: 'বাবা, তুমি কি জানো, মাদার একদিন একটা কুষ্ঠরোগীকে বুকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল নিজের বাড়িতে? সেখানে পৌঁছে লোকটা দেখল তার কুষ্ঠ সেরে গেছে!' মুকুন্দ শোনেনি। পুতুল বলেছিল, 'আমারও প্রাণে খুব দয়া আছে। বড় হয়ে আমিও মাদার টেরেসার মতো হবো। বাবা, তুমি ঠিক বলছ তো, মাদার ওখানে

আছে ?'

মনে পড়ায় আবারও চোখের পাতা ভিজে এলো মুকুন্দর। আট বছর বয়সের স্বপ্ন থেকে বড় হওয়ায় পেঁছিতে কত বছর লাগে ? ডাক্তার যতই আশ্বাস দিক, পুতুল কি অপেক্ষা করতে পারবে ?

প্রশ্ন ও সম্ভাবনা নিয়ে তার পরের সময়টুকু পার করতে লাগল মুকুন্দ। পুতুল আর কথা বলেনি। রমাও চুপচাপ। শুধু ঠিক সময়ে গন্তব্যে পেঁছিনোর উত্তেজনায় সাতটা কুড়ির ট্রেনটা যেন গতি বাড়িয়ে দিল আরো।

শিয়ালদায় পেঁছে, ট্যাক্সিতে উঠেও মুকুন্দ ও রমার নৈঃশব্দ্যে তফাত হলো না। ভিতরের যে-ইচ্ছা ট্রেনে আসতে আসতে মাঝে মাঝেই জাগিয়ে তুলছিল পুতুলকে, ফিরিয়ে আনছিল কথায়, হঠাৎই যেন হারিয়ে গেছে তা। ধরনটা একই—মাথা রমার কোলে, পা দুটো ছড়িয়ে রেখেছে মুকুন্দর জানুতে। নিঃশ্বাস যেমন পড়ে তেমনিই পড়ছে, শুধু মাঝে মাঝে ওর হাঁ-করা মুখের রং বদলানো এবং জোর করে পাশ ফেরার ধরন দেখে মুকুন্দর সন্দেহ হলো, হয়তো কাল থেকে পেটে কিছু না-পড়া ও এতটা আসার ধকল একটু বেশিই হয়েছে ওর পক্ষে। মেয়ের পায়ের চেটোয় হাত ঘষতে ঘষতে স্ত্রীর দিকে তাকাল সে। বলবে না ভেবেও বলল, 'তেষ্টা পাচ্ছে নাকি ? দেখবে একটু ?'

'পুতু, জল খাবি ?'

পুতুল চোখ খুলল একটু। মাথা নাড়ল। হাঁ-এর কাছে এসে জিবটা আটকে থাকল ক'মুহূর্ত, আবার স্বাভাবিক হবার আগে বুকের ওঠানামা বেড়ে গেল হঠাৎ।

ট্যাক্সিটা এগোচ্ছে লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে। মেয়েকে দেখতে দেখতে রমা বলল, 'এ ভোগান্তি আর কতক্ষণ চলবে ?'

ওর স্বরে কতটা ক্ষোভ, কতটা অধৈর্য, কতটা অসহায়তা তা ঠিকঠাক বুঝতে না পেরে নিজেও অসহায় বোধ করল মুকুন্দ। রমা প্রশ্নই করেছিল, সুতরাং, নিজের কাছে উত্তর না থাকা সত্ত্বেও কথা খুঁজল সে এবং বলল, 'আর তো কিছুক্ষণ—একবার নার্সিংহোমে পেঁছিলে ওরাই দেখবে।'

'আমি এই ভয়ই পাচ্ছিলাম—'

রমা যেখানে থামল, মুকুন্দও থেমে গেল সেখানে। সামনে ব্রিজ, চিড়িয়াখানা, তারপর ন্যাশনাল লাইব্রেরি, তারপর—, এইভাবে, সামনের সিটটা আঁকড়ে ধরে গতি যত দ্রুত হতে পারে তার চেয়ে দ্রুত এগোতে চাইল সে। ট্যাক্সিঅলাকে তাড়া দেবে ভেবেও দিল না। ঠোঁটে এরই মধ্যে দাঁত বসিয়ে ফেলেছে রমা। ও ভয় পাবে।

ব্রিজ পেরিয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরির দিকে ট্যাক্সি এগোতে না এগোতেই সতর্ক হলো মুকুন্দ। রাস্তার দু' পাশে মাঝেমধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ। গাড়িগুলোকে এগোতে দিলেও হাতের বেটন উঁচিয়ে ইশারা করছে দ্রুত হতে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কেন! আরো একটু এগিয়ে পুলিশের গাড়ি, পুলিশের ভিড় ও সামনে 'নো-এনট্রি'র বোর্ড দেখে থমকে দাঁড়াল ট্যাক্সিটা। একজন পুলিশ অফিসার ছুটে এসে গাড়ি ঘোরাতে বলল একবালপুরের দিকে।

মুকুন্দ পুতুলের দিকে তাকাল, তারপর রমার দিকে। তারপর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'উডল্যান্ড্স্-এ যাবো। মেয়েটা অসুস্থ—প্লিজ, যেতে দিন—'

'সরি। কিছু করার নেই। প্রধানমন্ত্রী আসছেন। এখন এক ঘণ্টা ওদিকে যাওয়া যাবে না।'

'প্লিজ—মেয়েটাকে দেখুন—'

অফিসার কিছু বলবার আগেই ছুটে এলো একটা লাল মোটর সাইকেল। তার আরোহী দুরন্ত অফিসার কড়া গলায় ধমক দিয়ে ট্যাক্সিঅলাকে গাড়ি ঘোরাতে বলল ডানদিকে। মুকুন্দ দেখল ট্যাক্সিটা ডানদিকেই ঘুরছে। তখন মরিয়া হয়ে ড্রাইভারকে বলল, 'গাড়ি থামান। আমরা হেঁটেই যাবো।'

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে পুতুলকে কোলে নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে এলো মুকুন্দ। পিছনে ব্যাগ হাতে রমাও।

ফুটপাতে উঠে মুকুন্দ বলল, 'একটু জোরে হাঁটো। উডল্যান্ড্স্ দূরে নয়—'

মুকুন্দর পায়ের জোর রমার নেই। প্রায় ছুটে এসে মুকুন্দর সঙ্গ ধরে সে বলল, 'এত জোরে হাঁটছ! মেয়েটার মুখ দেখেছ—ওর কষ্ট

হচ্ছে—'

'উপায় কী!' পুতুলকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, ফুটপাতে দাঁড়ানো লোকজনের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগোতে এগোতে মুকুন্দ বলল, 'একবার পেঁছিতে পারলে ওরাই দেখবে। তখন—'

কথা শেষ করতে পারল না। হঠাৎ সাইরেনের শব্দে চকিত হলো সে। আর এগোবার আগেই হাতের বেটন বাড়িয়ে একজন পুলিশ আটকে দিল তাকে। মুকুন্দ দেখল, ফুটপাত ঘিরে বেষ্টনী তৈরি করেছে পুলিশ। প্রায় ঝাপ্‌সা হয়ে আসা তার চোখের সামনে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের সঙ্গে ছুটে আসা গাড়িগুলো চমক দিয়ে পর পর বেঁকে যাচ্ছে নার্সিংহোমের রাস্তায়। এগোনো যাবে না।

যারা আশপাশে জড়ো হয়েছিল মুকুন্দদের ফুটপাতে বসে পড়তে দেখে জায়গা ছেড়ে দিল তারা। রমা ও মুকুন্দর কোলে ভাগাভাগি থাকা পুতুল তখনো নিঃশ্বাস নিচ্ছে—কখনো হাঁ করে, কখনো হাঁ না করে, বুকের ওঠানামায় তারতম্য ফুটিয়ে। চোখ বন্ধ। কে কতটা ঝুঁকে এলো, কে কী বলল, কিছুই শুনল না তারা।

আচ্ছন্নতার মধ্যে মুকুন্দ শুধু ভাবল, এক ঘণ্টা অনেকটা সময়। তবু, জন্মেই যার চলে যাবার কথা সে যদি আট বছর নিঃশ্বাস ধরে রাখতে পারে, তাহলে আরো এক ঘণ্টাও কি পারবে না!

প্রেমিক

বিনয়বাবু ঘরে ঢুকে বললেন, 'কী ভেবেছ তোমরা ! তোমাদের জ্বালায় কি আমার মানসম্মান থাকবে না !'

ভোর হয়ে গেলেও তখনো আলো ফোটেনি ভালো করে। বর্ষার আকাশ অনড় হয়ে আছে মেঘে। শেষ রাতে বৃষ্টি হয়েছিল।

একটা সময় ছিল যখন বিনয়বাবুর বাড়িতে প্রায়ই যাতায়াত করতাম আমি। এতদিনের পরিচয়ে গ্যারাজের ওপর আমার ছোট্ট কিন্তু ছিমছাম ফ্ল্যাটটির হদিশ পাওয়া বিনয়বাবুর পক্ষে অসম্ভব নয়। আমার মনে পড়ল একবার কী কারণে যেন তাঁর গাড়িতে লিফ্‌ট দিয়েছিলেন আমাকে। এই বাড়িটার রং চিরকেলে লাল ; মনে রাখা কী আর এমন কঠিন !

কিন্তু এখন আমি অবাঞ্ছিত। তাই এই সজল ভোরবেলায় আমি হেন অবাঞ্ছিতজনের ঘরে বিনয়বাবুর আবির্ভাবে স্পষ্টই বিচলিত হলাম। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তখন সবেমাত্র খবরের কাগজ নিয়ে বসেছি ; বিছানাটা অগোছালো, আমার বেশবাসও কোনো আগন্তুকের চোখের পক্ষে দুরস্ত নয়।

চেয়ারটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এই সকালে আপনি ! বসুন, বসুন।'

'বসব না। বসবার জন্যে আসিনি !'

আমার আপ্যায়নে একটুও ভাবান্তর ঘটল না বিনয়বাবুর। যেমন-কে-তেমন, অস্থির দেখাচ্ছিল তাঁকে। ঘরের সর্বত্র চোখ বুলিয়ে বললেন, 'অপর্ণা কোথায় ! রাত্রে বাড়ি না ফিরে কোথায় গেছে আমাকে বলো। না হলে পুলিশে খবর দেবো।'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। ভদ্রলোক কী বলছেন, কেন বলছেন, কিছুই বোধগম্য হলো না। অপর্ণা বাড়ি ফেরেনি, সেটা অবশ্যই চিন্তার কথা ; কিন্তু তার খোঁজে এখানে আসার কী মানে হয় ! কৈফিয়ত তলব করার মতো করে বললাম মনে মনে। কাল রাতের

ট্রেনে জামশেদপুর থেকে ফিরেছি কলকাতায়। বিনয়বাবুর কথাবার্তা আমার কাছে ধাঁধার মতো মনে হলো।

'অপর্ণা বাড়ি ফেরেনি!' কোনোরকমে সামলে নিয়ে বললাম, 'তাহলে গেল কোথায়—!'

'সেটা জানতেই ছুটে এসেছি। তোমার মুখ দেখতে আসিনি।'

রাগে উত্তেজনায় বিনয়বাবুর ভরাট মুখে একটা লাল আভা ফুটল। ধপ্ করে চেয়ারটায় বসে পড়ে বললেন, 'তোমরা কি ভেবেছ আমার মানসম্মান নেই! আমি জানি, ওই স্কাউন্ড্রেলটা ওকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু আমিও ছাড়ব না।'

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বিনয়বাবু। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'এ কেমন মেয়ে যে নিজের ভালো বোঝে না! শী মাস্ট কাম ব্যাক। আদারওয়াইজ—'

অবাক হলেও আমি ততক্ষণে ব্যাপারটা কিছুটা আঁচ করতে পারছি। কোনোরকমে তাঁকে নিরস্ত করে বললাম, 'আপনি এখন বাড়ি যান। আমি দেখছি। ও নির্মলের ওখানে যাবে—রাত্রে বাড়ি ফিরবে না, এটা হতে পারে নাকি! কোনো আত্মীয় স্বজনের বাড়ি টাড়ি—'

'আত্মীয় বলতে তো ওর মামাবাড়ি। তারা এখন পুরীতে—'

'আমি দেখছি। খোঁজ নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।'

'একটা পেটি স্কুলমাস্টারের সঙ্গে, উফ্!' দ্রুত নীচে নেমে এসে গাড়িতে উঠতে উঠতে বিনয়বাবু বললেন, 'আমার মেয়ে এমন করবে! ছি, ছি! ভাবতেই পারছি না।'

বিনয়বাবুর উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর আমাকে ক্ষুব্ধ করল। কী করা যায়, কী করে অপর্ণাকে ফিরিয়ে আনা যায়, কিছুই ঢুকছিল না মাথায়। স্পষ্ট করে কিছু না বললেও তিনি মিথ্যে বলবার লোক নন। তাছাড়া, কোন সমস্যায় পড়ে তাঁর মতো বিশিষ্ট এক ভদ্রলোক এই সকালে আমার কাছে ছুটে আসতে পারেন—স্পষ্টই তা উপলব্ধি করলাম আমি। অপর্ণা কিছুদিন থেকেই মরিয়া হয়ে উঠেছিল; কিন্তু বিনয়বাবুর সন্দেহ যদি সত্যি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সে বাড়াবাড়ি করেছে। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি যুবতীর পক্ষে রাত্রে বাড়ি না

ফেরা শুধু তার বাবা-মার পক্ষেই অসম্মানের নয়। জানাজানি হলে অপর্ণার পক্ষেও খারাপ। ও কি সত্যিই এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে!

পুরনো রাগটা চাগিয়ে উঠল মাথায়। ভাবলাম, এ নিয়ে নির্মলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। আমি নির্মলের চেয়ে ওয়েল-অফ্। নির্মলকে সন্দেহ করা সত্ত্বেও বিনয়বাবু যে আমার কাছেই ছুটে এসেছেন, তারও কি কোনো পরোক্ষ অর্থ থাকতে পারে! এসব ভাবতে ভাবতেই তৈরি করে নিলাম নিজেকে। নির্মল-অপর্ণা-অপর্ণা-নির্মল—নির্মলের ঠিকানার দিকে যেতে যেতে অন্যমনস্কতার ভিতর আমি ওদের কথাই ভাবতে লাগলাম। আজ অনেকদিন পরে আমার বুকের মধ্যে থেবড়ে থাকা ক্ষতটা চিনচিন করছে।

কলেজে এবং ইউনিভারসিটিতে আমরা এক সঙ্গে পড়েছি। আমি, নির্মল, অপর্ণা। অপর্ণার মতো সুন্দরী চট করে দেখা যায় না। ও এমন এক ধরনের মেয়ে, যুবক বয়সের শারীরিক প্রচণ্ডতায় খুব সহজেই যে আগুন জ্বালাতে পারে। যার কণ্ঠস্বর শুনলে, যাকে দেখলে ভালোবাসা প্রখর হয়, কাছে পেতে ইচ্ছে করে—কখনো মনে হয় দুই প্রবল বাহুর নিষ্পেষণে পিষে ফেলি। আবার কখনো—খুব মন খারাপের মুহূর্তে—যাকে একান্তভাবে পেতে ইচ্ছে করে, নৈঃশব্দ্যের মধ্যে।

অপর্ণাকে নিয়ে আমাদের মধ্যে রেষারেষির অন্ত ছিল না। অপর্ণার মন পাবার জন্য কী অসম্ভব চেষ্টাই না করেছিলাম আমি! গোড়ার দিকে ওর সম্পর্কটা ছিল আমারই সঙ্গে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার সব চেষ্টা, সব ইচ্ছেয় ছাই চাপা দিয়ে অপর্ণা নির্মলকেই তার দেহমনের একমাত্র দাবিদার ভেবে চলে গেল!

কী পেয়েছিল অপর্ণা নির্মলের মধ্যে! সত্যি বলতে, আমার সঙ্গে নির্মলের কোনো তুলনাই হয় না। হতে পারে না।—চেহারায় নিতান্তই সাধারণ, ছাত্র হিসেবেও তেমন ভালো ছিল না নির্মল। এখন বড়িশার দিকে একটা প্রায় গ্রাম্য স্কুলের মাস্টার। থাকে অবশ্য আমারই মতো, একা, একটা অন্ধকার ঘর ভাড়া করে। অন্যদিকে অপর্ণা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী, গানটান জানে, কলকাতায় বিশাল বাড়ি, গাড়ি, বিখ্যাত

অ্যাডভোকেট বাবা—ইত্যাদি। এসব যতই ভাবি ততই আমার মাথার ভিতর সব হিসেব গণ্ডগোল হয়ে যায়। অপর্ণার কথা ভাবতে ভাবতে আরও ভারী হয়ে এলো আমার নিঃশ্বাস। স্পষ্ট অনুভব করলাম, নির্মলের সঙ্গে ও যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, এখনো আমি ভালোবাসি অপর্ণাকে, যে কোনো মূল্যেই পেতে চাই ওকে। ঘুমের মধ্যে সে আমার চুলে বিলি কেটে যায়, তার দীর্ঘ চুম্বনের কল্পনায় অনেক রাতে আমি বিছানায় জেগে উঠে বসি।

ততক্ষণে হালকা রোদ উঠে পরিষ্কার হয়েছে আকাশ। বিছানায় উপুড় হয়ে পরীক্ষার খাতা দেখছিল নির্মল। আমাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'আ-রে, তুমি! এসো, এসো—'

নির্মলের ঠোঁটে আলগা হাসি। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কোনো নৈশ বিনোদনের চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। আড়ষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'নির্মল, অপর্ণা কোথায়?'

'অপর্ণা!' নির্মলকে চিন্তিত দেখালো, 'তুমি কি অপর্ণাকে খুঁজতে এসেছ এখানে!'

'হ্যাঁ।' কোনো দ্বিধা না করে ক্ষুব্ধ গলায় বললাম, 'তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করছ, নির্মল! বিনয়বাবু আজ সকালে এসেছিলেন আমার কাছে। অপর্ণা রাত্রে বাড়ি ফেরেনি!'

'কিন্তু—,' সময় নিয়ে নির্মল বলল, 'অপর্ণার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কাল সন্ধেবেলায়। এখান থেকে ওর মামাবাড়ি যাবার কথা—'

'মামাবাড়ি! ওর মামারা এখন পুরীতে—'

'না, সেটা সত্যি নয়। অপর্ণা মিথ্যে বলবে কেন।'

নির্মলের সামনে দাঁড়িয়ে ঈর্ষা ও রাগে আমার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। বললাম, 'তুমিই যে সত্যি বলছ তার প্রমাণ কি?'

নির্মল একটু চুপ করে থাকল, কী ভাবল যেন। তারপর বলল, 'তুমি এটা কেন ভাবছ ও এখানে রাত কাটাবে! আমিই বা তা চাইব কেন!'

নির্মলের শেষের কথাগুলো আমার কাছে তেমন জরুরি মনে হলো

না। আমার প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই পেয়েছি। নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'আমি কিছু ভাবছি না। ভদ্রলোককে ছুটে আসতে দেখে খারাপ লাগল, তাই এসেছিলাম। অপর্ণা তাহলে ওর মামা-বাড়িতেই গেছে। যাক, চলি।'

'একটু দাঁড়াও।' নির্মল বলল, 'আমিও বেরুব। কথা আছে।'

খাতাগুলো গুছিয়ে রেখে নির্মল বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমি ওর ঘর, ঘরের দীন আসবাব, বিবর্ণ দেওয়াল লক্ষ করতে লাগলাম। দেখতে দেখতেই শিথিল হয়ে এলো আমার হাত পা। যদি এমন হয়, আমি ভাবলাম, ওদের বিয়ে হলো, অপর্ণা এসে উঠল এই ঘরে—ও কি থাকতে পারবে! মুহূর্তে আমার চোখে ভেসে উঠল বিনয়বাবুর নিউ আলিপুরের বাড়ি—সেখানে অপর্ণার জন্যে আলাদা ঘর, আলাদা বাথরুম। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ওই বাথরুমের আয়তনই তো নির্মলের ঘরের চেয়ে কম নয়। অনেকদিন আগে এক সন্ধ্যায় অপর্ণার ঘর থেকে ভেসে আসা পিয়ানোর শব্দে বেজে উঠেছিল আমার রক্ত। সেই অপর্ণাকে এখানে কল্পনা করা যায় না।

নির্মল বলল, 'চলো। বাইরে বেরিয়ে একটু চা খাই। টানা দু'ঘণ্টা খাতা দেখেছি, ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে।'

নির্মলই আগে বেরুল। পিছন থেকে আমি ওর ক্লান্ত শরীর লক্ষ করলাম। দুঃখী মানুষদের একরকম চেহারা হয়—ভিতর-ফাঁপা গাছের মতো, যে কোনো মুহূর্তেই হেলে পড়তে পারে। কিন্তু সম্ভবত এটা আমার কল্পনা, আমি জানি এই মুহূর্তে নির্মলের চেয়ে সুখী আর কেউই নেই। বন্ধু হলেও ও আমাকে বঞ্চিত করেছে, কোনোই পাত্তা দেয়নি অপর্ণার প্রতি আমার আকর্ষণকে। ওর জন্যে আমি দুঃখিত হবো কেন!

কাছেই একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে মুখোমুখি বসলাম আমরা। নির্মল চা বলল। ক্লান্তির মধ্যেও ওর চোখে একটা সরল হাসি ফুটেছে। আমি ঈর্ষা বোধ করলাম। ওই হাসির উৎস আমি জানি। নির্মল হয়তো আমার আর অপর্ণার আগের সম্পর্ক স্মরণ করে এখনো করুণা করছে আমাকে। ওর চোখে চোখ রাখতেও অস্বস্তি হচ্ছিল আমার।

বয় চা দিয়ে যাবার পর নির্মল হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'কিছু

খাবে ?’

আমি না বললাম।

‘খেতে পারো।’ নির্মল বলল, ‘এখন মাসের শুরু, খুব একটা গরিব অবস্থায় নেই।’

অসহ্য! নির্মল যেন তার দৈন্যকেই সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। ওর সামনে নিজেকে কেমন খেলো মনে হলো আমার।

‘থাক।’ আমি বললাম, ‘আমার ফেরার তাড়া আছে—।’

কথা এগোচ্ছিল না। খানিক চুপচাপ বসে থাকার পর নির্মল বলল, ‘অপর্ণা বিয়ের জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তুমি কি করতে বলো ?’

‘বেশ তো!’ আত্মরক্ষার চেষ্টায় উল্টো গলায় বললাম, ‘এভাবে ব্যাপারটাকে ঝুলিয়ে রেখে লাভ কি! অনেকদিন তো হলো। যত দেরি করবে ততই ঘোরালো হবে।’

‘বাড়িতেও ও খুব শান্তিতে নেই।’ নির্মল বলল, ‘ওর বাবাকে তো তুমি জানো! আমাকে উনি অ্যাকসেপ্ট করতে পারছেন না। অপু কাল আমাকে বলছিল, বাড়িতে থাকা আর ওর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।’

নির্মলের কথাগুলো আমার বিশেষ অচেনা লাগল না। খেলাটা কি তাহলে শেষ হয়ে গেছে, বিচলিত হয়ে আমি ভাবলাম, যা স্বাভাবিক, এক্ষেত্রে কি তাই ঘটতে যাচ্ছে!

কিছু বলতে হবে বলেই বললাম, ‘তুমি কি ভাবছ ?’

‘ভাবা ছেড়ে দিয়েছি, আমি কোনোদিন ভাবিনি, এখন ভাবছি না। কিন্তু—।’ নির্মল ঝুঁকে এলো। একটু চুপ করে থেকে বলল, ‘ভাবছি এই বিয়েটা না হলেই ভালো হতো। আমার সন্দেহ হয়, শেষ পর্যন্ত অপু হয়তো আমার জীবন সহ্য করতে পারবে না।’

অবান্তর ভেবে জবাব দিলাম না আমি।

নির্মল বলল, ‘কাল অনেক বুঝিয়েছি ওকে। শুনতে চায় না। দেখি, আবার বোঝাবো। চলো—’

ফেরার রাস্তায় অনুভব করলাম বুকের ভিতর ঘন ও ভারী হয়ে

উঠেছে নিঃশ্বাস। ভাবলাম, অপর্ণা যে নির্মলের সঙ্গে রাত কাটায়নি, তার মামাবাড়িতেই গেছে—ওর বাবার কাছে সে খবর পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমাকেই বা নিতে হবে কেন!

বস্তুত, এক ধরনের ক্ষোভ পাগল করে তুলছিল আমাকে। এমন কিছু কি এর মধ্যে ঘটতে পারে না, ভাবলাম, যে-ঘটনা অপর্ণা ও নির্মলকে বরাবরের মতো আলাদা করে দেবে! রোজই তো কলকাতার রাস্তায় কত দুর্ঘটনা ঘটে, কত লোক মারা যায়। তেমনিভাবে, খুব সহজে, আর একজনও তো চলে যেতে পারে! কে যাবে! নির্মল? না অপর্ণা?

না, না, অপর্ণা নয়, অপর্ণা নয়।

কিন্তু, আমার কোনো ইচ্ছাই কার্যকর হলো না। কিছুদিনের মধ্যেই রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করল ওরা।

সাক্ষী হিসেবে নির্মল তার এক দূর সম্পর্কের দাদাকে ডেকে এনেছিল। অপর্ণা এনেছিল ওর বন্ধু শ্যামলীকে। আর আমি—অপর্ণা এবং নির্মল দুজনেই আমাকেও খবর দিয়েছিল।

আমার সমস্ত ঈর্ষা, দুঃখ ও যন্ত্রণা উস্‌কে দিয়ে সেদিন আরো চমৎকার হয়ে উঠল অপর্ণা। শুধু নিজের জন্যে নয়, আমার কষ্ট হচ্ছিল অপর্ণার জন্যেও। নির্মল তো ওর যোগ্য নয়, আমিও কি যোগ্য ছিলাম!

এসব দার্শনিক চিন্তার জেরও বেশিক্ষণ থাকল না মনে।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে রেস্তোরাঁয় কিছু খাওয়া-দাওয়া হলো; খানিক রঙ্গ-রসিকতাও। চোরা চোখে সারাক্ষণ আমি লক্ষ করছিলাম অপর্ণাকে—এখন ওকে দেখাচ্ছে রানির মতো; চোখে মুখে ফুটে উঠেছে পুরুষের অধিকারে চলে যাওয়া নারীর লাবণ্য। আমার বুকের মধ্যে একটা সুন্দর স্বপ্ন ধীরে ধীরে গুঁড়িয়ে যেতে থাকল। এমনই কি হবার কথা ছিল, ভাবলাম, একদিন খুব কাছাকাছি এসেও যে অপর্ণা প্রত্যাখ্যান করেছে আমাকে, আমার তো প্রতিশোধ নেওয়া উচিত ছিল তার ওপর। বদলে আমি সাক্ষী থাকলাম ওর বিয়ের! সম্পর্কটা তাহলে শেষই হয়ে গেল, সেইসঙ্গে সব সম্ভাবনাও। ভাবতে ভাবতেই আমার শরীরে ঘনিয়ে এলো

প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে নির্মলের দাদা আর শ্যামলী চলে গেল। আমিও যাচ্ছিলাম। অপর্ণা যেতে দিল না।

এরই মধ্যে গড়িয়ার দিকে একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিল ওরা। এখন সেখানেই যাবে। নির্মল আমাকেও ট্যাক্সিতে উঠতে বাধ্য করল।

ড্রাইভারের পাশের সীটে বসে বসে সারাক্ষণ সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। কঠোর হয়ে উঠল চোয়াল। পিছনে বসে আছে আমার দুই আততায়ী, আমাকে খুন করার পর আজ রাতে ওরা শরীরে শরীর ঘষে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবে।

'কি, চুপ করে আছ কেন!' অনেকটা রাস্তা এগিয়ে এসে অপর্ণা বলল, 'তোমাকে হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর লাগছে?'

'না, কিছু নয়—।' বুঝলাম না অপর্ণা আমাকে ঠাট্টাই করল কিনা।

'আমি জানি তুমি এখন কি ভাবছ!'

অপর্ণার কথা শুনে এই প্রথম পিছনে তাকিয়ে আমি দেখলাম, অপর্ণার ঘাড়ের পিছন দিয়ে ঘুরে নির্মলের একটা হাত ঘিরে রেখেছে ওকে। অসম্ভব! আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল।

অপর্ণা কী বলবে এরপর? এমন কিছু কি, যা আমাকে আরো ছোট করে দেবে! না, তা আমি হতে দেবো না।

আমি বা অপর্ণা কিছু বলবার আগেই নির্মল বলল, 'অপু, তোমার বন্ধুকে একদিন আমাদের সঙ্গে খেতে ডাকো না?'

অপর্ণা বলল, 'হ্যাঁ, এসো না একদিন? পরশু রবিবার। আসবে?'

অসহ্য! সমস্ত ব্যাপারটাই অসহ্য মনে হচ্ছিল আমার কাছে। অনুভূতি বলে দিল, আর এক মুহূর্তও এদের সঙ্গে থাকা উচিত নয়।

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে গাড়ি থামানোর নির্দেশ দিয়ে অন্ধকারেই অপর্ণার মুখের দিকে তাকালাম আমি।

দুজনেই অবাক হলো। অপর্ণা বলল, 'কী হলো? নেমে

যাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ, একটু কাজ আছে।' ট্যাক্সি থেকে নামার আগে বললাম, 'তোমরা একটু গুছিয়ে নাও, তারপর একদিন যাওয়া যাবে। আর হ্যাঁ, তোমার অসুখটার ব্যাপারে সাবধান থেকো। এসব চেপে রাখতে নেই। এখন তোমার বাবা তো আর দেখছেন না—নির্মলকে খুলে বোলো সব—'

'অসুখ!' অস্ফুটে উচ্চারণ করল নির্মল।

'কী বলছ এসব!' চমকে উঠে অপর্ণা বলল, 'আমার তো কোনো অসুখ নেই!'

'লুকিয়ে রেখে লাভ নেই, অপর্ণা। তুমি জানো কেন তোমার বাবা বিয়েতে রাজি হচ্ছিলেন না। নির্মলের প্রতি তোমার একটা দায়িত্ব আছে।' ট্যাক্সির দরজাটা বন্ধ করার আগে আমি বললাম, 'ভয় কি! এখন নির্মলই তোমার সব। একদিন যা আমাকে বলতে পেরেছিলে তা নির্মলকে বলতে পারবে না কেন!'

দেখলাম, ট্যাক্সির অন্ধকারে স্তম্ভিত মুখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। পরের মুহূর্তেই ট্যাক্সিটা আমাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল।

অনেকদিন পরে হাসিতে খলবল করে উঠল আমার বুক। চমৎকার, চমৎকার হয়েছে। আমি জানি, অপর্ণার অসুখ কোনোদিনও সারবে না। আর যত দিন যাবে, আমার কথার বিষে অসুখটা নির্মলের মধ্যেও সংক্রামিত হবে ক্রমশ। ও সন্দেহ করবে অপর্ণাকে। তেমন-তেমন হলে অপর্ণাও কি ঘৃণা করতে শুরু করবে না ওকে?

প্রতিশোধ নিতে পারার আনন্দে আমার পা দুটো এরপর সাবলীল হয়ে উঠল।

স্বভাবের ছায়া

কদিন থেকেই দুজনের মধ্যে একটা থমথমে ভাব ছিল। খুব দরকার না হলে কথাবার্তা প্রায় হতোই না। বাড়িতে ফাই-ফরমাস খাটার জন্যে আছে একজন বয়স্কা মহিলা--- তেমন-তেমন দরকার হলে তার মাধ্যমেই কাজ সেরে নেওয়া যেত।

পরশু যেমন হলো।

অনিমেষ অফিস থেকে ফেরার পর পরই দেখা করতে এলেন দুই ভদ্রলোক। অনিমেষই দরজা খুলেছিল। ভিতর থেকে গলা শুনে শুভা বুঝতে পেরেছিল রমেনবাবুরা। এ-পাড়ায় থাকেন, রাজনীতি থেকে সোশ্যাল কমিটি সবকিছুর সঙ্গেই যুক্ত; ঘনিষ্ঠতা আছে অনিমেষের সঙ্গে। মাঝে-মধ্যে বাড়িতে এলে অনিমেষ খাতির করতে ত্রুটি রাখে না। লোকটা কাজ দেয়। রমেনবাবুকে খাতির করা শুভারও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

সমস্যা হলো, কীভাবে কর্তব্য করবে। এক কাপ চা হয়তো এগিয়ে দেওয়া যায়; কিন্তু শুধু চায়ে পরে অসন্তুষ্ট হতে পারে অনিমেষ, বলতে পারে শুভা সুবিধে-অসুবিধে বোঝে না। বিশেষত ঘটনাটা যদি অনিমেষকে নিয়ে হয়, কিংবা তার কোনো বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে। এরকম খুঁটিনাটি ঘটনা প্রায়ই বেরিয়ে পড়ে। ঘটনা সামান্য হলেও তার জের চলে অনেক দূর পর্যন্ত---এ-সবের মধ্যেই অনিমেষ শুভার প্রত্যক্ষ অবহেলা লক্ষ্য করে। অনিমেষের বিরুদ্ধেও এরকম অনেক অভিযোগ আছে শুভার। প্রস্তুতি ছাড়াই, ঠিক বোঝা যায় না, কখন, কোনদিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঘটনাগুলো। কিংবা তার পরিণতিই বা কী রকম হবে!

অন্য সময় হলে শুভা নিজে কিছুই ব্যবস্থা করতে পারত। মাসের শেষে হাত-টান, তাছাড়া এমন হুট্ করে কেউ যে এসে পড়বে তাও তো ভাবেনি। এখন চায়ের অতিরিক্ত কিছু দিতে হলে অনিমেষের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। সুতাং সিগারেটের প্যাকেট

নিতে ভিতরে এলে, কাজের মহিলাকে শুনিয়ে শুভা বলল, 'বাবুকে জিজ্ঞেস করো খাবার-দাবার কিছু দিতে হবে কিনা। টাকা নিয়ে বরং সিঙাড়া কচুরি নিয়ে এসো—'

কথাগুলো অনিমেষকেই বলা ; অনিমেষ বুঝবে না এমন নয়। লোকটিকে ডেকে নিজেই সে কী কী আনতে হবে বলল, দাম গুণে টাকা দিল হাতে, তারপর বলল, 'বউদিকে বলো চা-টা আগে পাঠিয়ে দিক -'

বলতে হয় না ; যাকে বলা হলো সে নিজেই উৎকর্ণ ছিল, শুনতে পায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা নিয়ে বসার ঘরে চলে আসে শুভা, হেসে কথা বলে রমেনবাবুর সঙ্গে, এমনকি চলে আসার আগে অনিমেষের উদ্দেশে বলে, 'বেশি গরম নেই, খেয়ে নাও।'

দেখে বা শুনে কেউ বুঝবে না দুজনের মধ্যে চলছে একটা ঠাণ্ডা লড়াই—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে, অন্তত লোকচক্ষুতে, যে-টুকু নিয়ম না রাখলেই নয়, তার বেশি কেউই এগোচ্ছে না।

কিন্তু এটা যে সত্যিই কোনো নিয়ম নয়, এভাবে যে চলে না, শুভা এবং অনিমেষ দুজনেই বুঝতে পারছিল সেটা। মুখে কিছু না বলুক, দিন দু'তিন নিরপেক্ষভাবে কাটানোর পর থেকেই দুজনের ব্যবহারে তা ফুটে উঠল পরিষ্কার।

চাপ বেশি পড়লে মাঝে মাঝে অফিসের কাগজপত্র বাড়িতে নিয়ে আসে অনিমেষ। শুভার সঙ্গে বেড়ানো বা সিনেমা থিয়েটারে যাওয়া বা এমনি টুকিটাকি কথার ফাঁকে সুযোগ পেলেই সেরে নেয় কাজগুলো। এমনও হয় যে আলস্যে শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারল না ; পরদিন যেমন এসেছিল তেমনি কাজগুলো আবার ফিরে গেল অফিসে। শেষের ব্যাপারটা ঘটলে শুভা স্পষ্টই ব্যঙ্গ করে তাকে।

'শুধু শুধু লোক-দেখানোর জন্যে কাগজগুলো বাড়িতে আনার কী মানে হয়! খামোকা বোঝা না বয়ে ওগুলো অফিসে রেখে এলেই পারো—'

অনিমেষও বলতে ছাড়ে না। বরং বলার ব্যাপারে তার কথার ধারই বেশি।

'যা বলেছ! কাজ না দেখিয়ে লোকজনকে এবার স্ত্রীরত্নটিকে দেখালেই হয়—তাতে অন্তত বুঝবে অফিসের কাজ না করি, অন্যান্য কাজে ফাঁকি দিই না!'

'তা বইকি!' শুভা না-লজ্জা না ভৎর্সনার ভাব ফুটিয়ে বলে, 'নিজের হ্যাংলামোর কথা ঢাকঢোল পিটিয়ে লোককে না জানালে তোমার স্বস্তি হবে কেন!'

এ-সবই অবশ্য সুখের দিনের কথা। অন্তত বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। এখন দুজনের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হবে না এমন কথাও তারা কোনোদিন বলত!

কাজ বলতে এখন কাজই বোঝে অনিমেষ। দুজনের বাড়িতে সন্ধেয় অফিস থেকে ফেরার পর চার-পাঁচ ঘণ্টা কাটাতে হবে একা-একা কাজ অন্তত তাকে কিছুটা অন্যমনস্ক হবার সুযোগ দেয়, রাগটা আড়াল করে রাখে। অফিস থেকে ফিরে জামা জুতো খুলে এবং হাতমুখ ধুয়ে সোজা বসার ঘরে এসে কাগজপত্র খুলে বসে অনিমেষ। চা, খাবারও পরিবেশিত হয় সেখানেই। শুভা যে ইচ্ছে করেই কাছে আসছে না বা এড়িয়ে যাচ্ছে এটা বুঝতে অনিমেষের অসুবিধে হবার কথা নয়। ভাববাচ্যে আদানপ্রদান থেকেও ইদানীং তারা সরে গেছে দূরে। সুতরাং কাজে মন দেওয়া ছাড়া তার আর উপায় থাকে না কোনো। ঠিক এই সময়েই হয়তো কিছু ভেবে শুভা এ-ঘরে এলো, বসল, একেবারে কাছাকাছি না হলেও কাছে—সকালের খবর কাগজটা টেনে নিল হাতে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল অনিমেষ, কাগজপত্র নিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। যেন শুভার ছায়াও এখন তার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে। নিজের মধ্যে ডুবে-যাওয়া ছাড়া শুভার উপায় থাকে না কোনো।

শুভার ধরন আলাদা। মেয়ে বলেই সম্ভবত অনিমেষের মতো ধীরেসুস্থে পেঁচিয়ে জড়িয়ে কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এমনও হতে পারে, তার ভিতরের সর্পিলতা ভিতরেই ল্যাজ ঝাপ্টায়, বাইরে শুধু বিষটুকু ঢেলে দিতে পারলেই হলো। অনিমেষকে পাল্টা জবাব দেবার পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট।

সেদিন যেমন হলো। সাতটার কিছু আগেই অফিস থেকে ফিরেছে

অনিমেষ, চা-টা খেয়ে বসার ঘরে নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ; শুভা কোথায়, কী করছে তা নিয়ে তার সামান্যতম মাথাব্যথা নেই। ন'টা নাগাদ শুভা হঠাৎ যেমন-কে-তেমন পোশাকে চটি ফটফট করতে করতে ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'আমি একটু বেরুচ্ছি—।' বলে, বেরিয়ে যায় সত্যিই। বিভ্রান্ত অনিমেষ অন্ধকারে কোথাও আর খুঁজে পায় না শুভাকে। জ্বলে, জ্বলতে থাকে। তবু ব্যস্ত হয় না এতটুকু। জানে তো, তাকে জব্দ করার জন্যেই কুড়ি মিনিট, আধঘণ্টা পরে ফিরে আসবে আবার।

চলছিল এইভাবে। পারস্পরিক স্পর্শ ও সংস্পর্শ থেকে দূরে, পরস্পরকে টেক্কা দিতে দিতে। ব্যাপারটা মোড় নিল সেদিন রাতে, বিছানায়।

অনিমেষের স্বভাবের নানা প্রবণতার একটি তার যৌন কাতরতা। এটা অস্বাস্থ্যকর নয়, শারীরিক ইচ্ছা তৃপ্ত করার জন্যে তাকে, বিয়ের পরে অন্তত, এদিক-ওদিক ছুটতে হয়নি। ঘরে আছে সুন্দরী ও যুবতী স্ত্রী এবং কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাদের দাম্পত্য জীবনে অসন্তোষ দেখা দেয়নি কখনো। অনিমেষ বাইরে ছুটবে কেন? বরং বলা যায়, এ ব্যাপারে সে রীতিমতো একনিষ্ঠ ; সুযোগ বা প্রলোভন সত্ত্বেও বিচ্যুত হয়নি। নিজস্ব ভাবে সে বেশ স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ, কথাবার্তাতেও চটপটে—সম্ভবত এই কারণেই অফিসের একটি, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান যুবতী কিছুদিন তার দিকে ঝুঁকেছিল। অফিসে এখনো যে তিন-চারজন অ্যাংলো আছে তার মধ্যে এরই বয়স কম। অড্রি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই নানা কথা বলত লোকে ; তার একটি একদা অড্রি তাদের পার্সোনাল ম্যানেজার মিস্টার রক্ষিতের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিল। ছুটির পর অনেকেই দেখেছে রক্ষিত আর অড্রি ঘুরছে একসঙ্গে। পার্ক স্ট্রিটের দামি রেস্তোরাঁয় কিংবা চৌরঙ্গির সিনেমা হাউসে বসে আছে পাশা-পাশি ; তথাকথিত প্রত্যক্ষদর্শীরা ওদের মধ্যে একটা শোয়াশুয়ির ব্যাপারও সমর্থন করত। কী কারণে দুজনের মেলামেশা ছিন্ন হয় সেটা অবশ্য কেউ বলতে পারে না ; যেমন কেউ বলতে পারে না কেন সে ঝুঁকেছিল অনিমেষের প্রতি, কেন অনিমেষ সম্পর্কে লোকজনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, হি ইজ ড্যাম ইউজফুল, কেনই বা তাকে যেতে

বলত ইলিয়ট রোডে তার একলা ফ্ল্যাটে। অফিসে অনিমেষের যা পদমর্যাদা ও ক্ষমতা তাতে অদ্রির কাজ সে কিছুটা হাল্কা করে দিতে পারে, কিন্তু কারও মাইনে বাড়িয়ে দেবার মতো কার্যকর ক্ষমতা তার নেই। তাহলে অদ্রি তার প্রতি ইচ্ছাপরবশ হয়ে উঠবে কেন! কিন্তু ঘটনাটা এই, অদ্রি ঝুঁকেছিল—কিছুটা মাখামাখির ভাবও দেখিয়েছিল : এবং যে যা-ই বলুক, সম্পূর্ণ নৈতিক কারণে অনিমেষ এড়িয়ে যায় ওকে।

স্ত্রীর সঙ্গে তার যৌন সম্পর্ক ছিল নিয়মিত। আর, প্রবণতা বেশি হলে যা হয়, এ-ব্যাপারে তার জেদ ও স্বার্থপরতা যে একটু বেশি সেটা তার মাথায় ঢুকত না। শুভা কখনো-সখনো আপত্তি করেছে, বিশেষত সেইসব দিনে—যখন সে পুরোপুরি ভালো নেই, শরীরে লেগে আছে জ্বরের ভাব ; কিন্তু অনিমেষের পরোক্ষ চাপ কোনো সময়েই স্থির থাকতে দিত না তাকে। কোনোদিন মুখ ফুটে না বললেও এইসব সময়ে—অনিমেষ যখন তাকে খুঁড়ছে—শুভা ভাবত, মৃত্যুর পরেও যদি অর দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, সম্ভবত সেই উদাসীন শরীরে লিপ্ত হয়েও একইরকম সুখে তীব্র হবে অনিমেষ। একরকম বিষণ্ণতার বোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত সে। কিন্তু তাৎক্ষণিকতার বাইরে অনিমেষের অসংযম খুব একটা রেখাপাত করত না তার মনে, এটাকে সে ভেবে নিত দাম্পত্যেরই অঙ্গ হিসেবে ; কারণ, আর যা-ই হোক, তাকে সুখে রাখার ব্যাপারে অনিমেষের কার্পণ্য ছিল না কোনো।

সোজা কথায় শারীরিক ব্যাপারে শুভা ছিল ঈষৎ ঠাণ্ডা ; কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নয়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যতটা দাবি করে তার চেয়ে বেশি উৎসাহ প্রায়ই সে দেখাত না। মনান্তর ও মনোমালিন্যে, তাই, প্রধান অসুবিধেটা অনিমেষই ভোগ করতে লাগল। দুজনের মধ্যে কথা বন্ধ, এমনকি একজন যখন আরেকজনের উপস্থিতিও সহ্য করতে পারছে না—এরকম সময়ে সেতু গড়ে তোলার সম্ভাবনাও অবাস্তব। অনিমেষের রুচি ও সভ্যতাবোধ, এমনকি জেদও, শারীরিক অস্বস্তির মধ্যেও কয়েকদিন নিরস্ত করে রাখল তাকে। শেষে একদিন পরিষ্কার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব যতই বেশি হোক, তারা শুচ্ছিল একই

বিছানায়। অস্পষ্ট ভাবে হলেও জাগরণের বৈষম্য সঞ্চারিত হয়েছিল ঘুমেও। যেমন, শুভা ও অনিমেষ দুজনেই পা-বালিশ ব্যবহার করে, এখন দুটো বালিশই চলে এলো দুজনের মাঝখানে। যেমন, বিছানায় শোয়া থেকে ঘুমনোর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত অনিমেষ ডানদিকে ফিরে শুলে শুভা ফিরত বাঁদিকে, না হলে এই সময়টা দুজনের মধ্যে চলত প্রত্যক্ষ নিঃশ্বাসের বিনিময়। যেমন, গভীর ঘুমের মধ্যে অনিমেষের একটি অসাবধান হাত হয়তো শুভার গায়ে এসে পড়ল, শুভা তাচ্ছিল্য করল না, কিন্তু আচমকা ব্যাপারটা টের পেয়েই সরে গেল একটু—যাতে দূরত্বটা থেকে যায় ঠিক আগেরই মতো। অনিমেষ নিঃসাড়ে ঘুমোয়, শুভার মতো অতটা স্পর্শকাতরও সে নয়—অন্তত ঘুমে, তখন কী হলো না হলো টের পায় না ঠিক।

ঘটনাটা ঘটল অদ্ভুতভাবে। সেদিন বিছানায় এসে অনিমেষ আর সামলাতে পারল না নিজেকে। নাগালের মধ্যেই অন্যদিকে পাশ ফিরে শুয়ে থাকা শুভাকে হাত বাড়িয়ে টানতে চাইল নিজের কাছে। শুভা প্রথমে আড়ষ্ট করে নিল নিজেকে, তারপর প্রবল বিদ্বেষে অনিমেষের হাতটা ঠেলে দিল দূরে।

'ব্যাপার কী! গায়ে হাত দিচ্ছ কেন?'

'কেন!' থতমত খেয়ে বলল অনিমেষ, তারপর, শুভার মনোভাব আঁচ করে, নরম গলায় বলল, 'অমন করছ কেন! এসো না?'

আবার সে হাতটা বাড়িয়ে দিল শুভার দিকে, একটু বা কাছে টানার চেষ্টা করল ওকে।

হাতটা এবার প্রায় ঘৃণায় ঠেলে সরিয়ে দিল শুভা। অনিমেষ কী চায় তা বুঝতে পারছিল স্পষ্ট। তারপর শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসল বিছানায়।

'কী পেয়েছ আমাকে? বেশ্যা?'

'আজেবাজে কথা বলো না।'

'বলব। একশোবার বলব। লজ্জা করে না! সাতদিন ধরে মুখ তুলে তাকানোর প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করোনি, এখন নিজের দরকারে ঠিক এসেছ! তুমি মানুষ, না জানোয়ার!'

'জানোয়ার আমি নয়, তুমি। স্বামীকে জানোয়ার বলার জোর

কোত্থেকে পাও তা আমি জানি না ভেবেছ! বেশ্যা নয়, তুমি বেশ্যাদের চেয়েও খারাপ! বেশ্যাদের তবু একটা লয়্যালটি থাকে—'

যেখানে দুজনেরই, বা দুজনের একজনের থেমে পড়া উচিত ছিল, সেখানে কেউই না থেমে, ওরা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নেমে পড়ল। শুভার শরীরে এখন ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নেই।

নির্লজ্জ কামুকতা থেকে অনিমেষও আচ্ছন্ন হয়েছে ক্রোধে। এখন ওদের থামানো যাবে না। অনেক মানুষেরই জীবনে একটা না একটা পূর্ব ইতিহাস থাকে, জানাজানি হলেও সুখের দিনে সেগুলো নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না। কিন্তু আক্রমণের উদ্দেশ্য থাকলে এগুলোকেই কাজে লাগানো যায় অস্ত্র হিসেবে। বিয়ের আগে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়-যুবকের যে শুভার প্রতি টান ছিল—যে খুব স্বাভাবিকভাবে অনিমেষেরও বন্ধু হয়ে গেছে এখন এবং ক্বচিৎ কখনো আসে এ-বাড়িতে—এ-গল্প কি শুভাই করেনি অনিমেষের কাছে! কাজকর্মে অনিমেষ অনেকটা সময়ই বাড়ির বাইরে থাকে, শুভা তখন মা'র কাছে বা কাকার বাড়ি যাচ্ছে বলে বাড়ির বাইরে যায়—অনিমেষ জানে শুভার এ-সব কথায় ভান নেই কোনো। তবু, এখন—যখন স্ত্রী বেশ্যা এবং স্বামী জানোয়ারে পরিণত—অনিমেষ কী করে বুঝবে এ-সবের আড়ালে শুভা সেই যুবকটির সঙ্গে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে না! অনিমেষের স্পর্শে শিউরে ওঠা বা বিরক্ত হয়ে ওঠার কারণ কি এই নয় যে গোপনে শুভা তার শরীর তৃপ্ত ক'রে নিচ্ছে! বা, অদ্রি নামে অফিসের যে-মেয়েটি সম্পর্কে অনিমেষ প্রায়ই হেসে-হেসে গল্প করেছে শুভার কাছে, শুভা কী করে বুঝবে, অনিমেষের এ-সব গল্প নিতান্ত অপরাধবোধ আড়াল করার জন্যে নয়। অনিমেষ যেরকম যৌনকাতর, তাতে ওর পক্ষে নিতান্তই গল্প আর কৌতূহলে সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়, বিশেষত সুযোগ যেখানে এত! শুভা কী করে বুঝবে অনিমেষ প্রতারণা করছে না তার সঙ্গে! অনিমেষের সহকর্মী প্রভাত একদিন এসেছিল বেড়াতে, অদ্রির কথা উঠল। সেদিন প্রভাত যখন বেশ উৎসাহে অফিসে অনিমেষ-অদ্রিকে নিয়ে রটনার কথা বলে যাচ্ছিল, ইশারায় ওকে থামিয়ে দিয়েছিল অনিমেষ। কেন? সম্ভবত অনিমেষ লক্ষ করেনি, শুভার কান ছিল প্রভাতের গল্পে, কিন্তু যতই অন্যমনস্ক-

ভাবে হোক, দৃষ্টি ছিল অনিমেষের ওপর। ইশারাটা চোখ এড়ায়নি তার। অনিমেষ শুভাকে চিনলে শুভা কেন অনিমেষকে চিনবে না!

এইভাবে শুরু। এইভাবেই ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া যুদ্ধের দিকে। ঘর অন্ধকার, রাতও হলো অনেকটা—বিছানা থেকে উঠে, ঠাণ্ডা মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে, স্বামী ও স্ত্রী ক্রমশ বদলে নিল এতদিন ধরে সৃষ্টি করা তাদের হাত, পা ও ব্যবহারের অর্থ। অনেক বেশি রাতে বালিশে মুখ গুঁজে বৈধব্যগ্রস্ত মানুষের মতো পড়ে থাকে শুভা। আর বসার ঘরে, একা বসে থেকে, সিগারেট জ্বালতে গিয়ে হাত কাঁপে অনিমেষের—দেশলাই নিয়ে যায় বারবার।

তাদের মধ্যে আবার কথা হয় পরের দিন। অনিমেষ অফিসে বেরুবার আগে বলল, 'আমার যা বলার বলেছি। ভালো না লাগলে চলে যেতে পারো। আমিও তাই চাই—'

শুভা বলল, 'জানি তো!'

অনিমেষ আর কিছু বলবে কিনা ভাবল, একটু দাঁড়াল। শুভা সাধারণত যে-গলায় কথা বলে তার চেয়ে এই স্বর আলাদা—দুটি মাত্র কথার তাৎপর্য আরো বহু কথার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে অনিমেষের যাবার রাস্তা করে দিল সে। কিছু বলতে হলে অনিমেষকে এখন পুরো ঘটনাটাই ভাবতে হবে আগাগোড়া—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিতরেও খুঁজতে হবে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক। কী লাভ!

সে রাস্তায় পা দিল।

সন্ধেয় বাড়ি ফিরে শুভাকে দেখতে পেল না অনিমেষ। আজ শুভা কোথাও যাবে এমন কথা সে আগে শোনেনি; শোনবার মতো উপলক্ষও ছিল না—বিশেষত কাল রাতে যা ঘটে গেছে তার পরে। যতই মনোমালিন্য হোক, ছ'বছরের বিবাহিত জীবনে তার অজ্ঞাতসারে শুভা কখনো অনুপস্থিত থাকেনি। আজ সে কোথায় গেল!

আশঙ্কা থেকে বিভ্রান্ত বোধ করল অনিমেষ। কাজের মহিলাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, সে অফিসে বেরুবার কিছুক্ষণ পরেই শুভা বেরিয়েছিল, কিছু বলে যায়নি।

সকালে শুভা বলেছিল, 'জানি তো!' এখন কথা দুটো আমূল

বিদ্ধ করে গেল তাকে। জামা, জুতো খুলে বাথরুমে গেল অনিমেষ, জল দিল চোখেমুখে, তারপর বিছানায় এলিয়ে পড়তে পড়তে ভাবল শুভা চলে গেছে।

শুভা না থাকলেও অনিমেষের কখন কী দরকার ছ'বছর এক সঙ্গে থেকে কাজের লোকটির মোটামুটি সে ধারণা হয়েছে। দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খাবার দিয়ে যাব ?'

'না।' ইচ্ছে ছিল না। একটু ভেবে অনিমেষ বলল, 'শুধু চা দাও—'

লোকটি চলে যাচ্ছিল। কিছু ভেবে আবার তাকে ডাকল অনিমেষ। তারপর যে-জন্যে ডেকেছিল সেই কথাটি বলবার ভরসা হারিয়ে, বলল, 'আলোটা নিবিয়ে দাও—'

আলো নেবার পর একটা সিগারেট ধরাল অনিমেষ।

শীত পড়তে এখনো দেরি আছে বেশ। তবু, শুধু গেঞ্জি গায়ে অল্প শীত করছিল। জামাটা আবার গায়ে দিয়ে নেবার কথা ভেবেও বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করল না—শিরশিরে অনুভূতি নিয়ে এখন সে পরিষ্কার লগ্ন হয়ে আছে বিছানার সঙ্গে, মনে হচ্ছে জ্বরগ্রস্ত। অনুভূতিটা জিইয়ে রাখার চেষ্টা করল অনিমেষ। তারপর, প্রথম টানের ধোঁয়াটা বুক পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে ভাবল, শুভা চলে গেছে। এটা একটা ভাবনা মাত্র—অনুভূতিতে নতুন কোনো তাৎপর্য যুক্ত হলো না। চা এসেছিল ; অনিমেষ কাপটা নামিয়ে রেখে চলে যেতে বলল লোকটিকে ; আর একটি প্রশ্নের উত্তরে বলল, রাত্রে তার খাবার ইচ্ছে নেই।

অন্ধকারে, বিছানায় শুয়ে, শুভার থাকা এবং না-থাকার মধ্যে পার্থক্যটা কতদূর তা বুঝবার চেষ্টা করছিল অনিমেষ, পরিষ্কার কিছু ধরতে পারছিল না। আজ, কিছুক্ষণ আগেও, অফিস থেকে বাড়ি ফেরার আগে পর্যন্ত, এই অবস্থাটা অনুমান করতে পারেনি সে—বস্তুত, বিচলিত হয়ে পড়ার মতো প্রয়োজনীয় সময় এখনো সে পার করেনি। শুভা হয়তো ফিরবে, যেমন ফিরেছে এর আগেও। কাছেই দুটো বাড়ির পরে থাকে নীলিমাদি, এমনও দিন গেছে যখন অফিস থেকে ফিরে অনিমেষ শুনেছে নীলিমাদির সঙ্গে সিনেমায় গেছে শুভা,

কিংবা মার্কেটে। যাবার জায়গা আরো আছে শুভার—ভবানীপুরে বাপের বাড়িতে, সেখানে, বালিগঞ্জে থাকে এক পিসতুতো দিদি, সেখানেও। এগুলো তার ঘনিষ্ঠ যাবার জায়গা। এছাড়াও আছে বন্ধু-বান্ধব, যারা কলেজে পড়ত শুভার সঙ্গে, যাদের কাউকে কাউকে এক-একদিন হঠাৎ নিজের বাড়িতেও শুভার সঙ্গে গল্পরত অবস্থায় আবিষ্কার করেছে অনিমেষ। শুভা না থাকলেও, অফিস থেকে ফিরে সে যাতে অসুবিধেয় না পড়ে সেজন্যে ব্যবস্থা থাকে পরিচ্ছন্ন—না চাইতেই মুখের কাছে এসে যায় চা, খাবার ইত্যাদি, আজ যেমন এলো। তফাত এইটুকু, সেসব দিনে অনিমেষের চোখে আলোটা প্রকট হয়ে ওঠেনি, বা আলোটা সে নিবিয়ে দেবার কথাও ভাবেনি। যাবার আগে, সেসব দিনে, শুভা একটা ঠিকানা রেখে যেত।

কিছুই গুছিয়ে ভাবতে পারছিল না অনিমেষ, একটু এলোমেলো-ভাবে মাঝে মাঝে সিগারেট টানতে টানতে এসে যাচ্ছিল ভাবনাগুলো। শুভার থাকা ও না-থাকার মধ্যে পার্থক্যটা স্পষ্ট হবার মতো তেমন কিছু ঘটেনি এখনো—যদি ঘটে থাকে, সেও অনিমেষেরই সৃষ্টি, নিজেকে হঠাৎ গুটিয়ে নিয়ে সে এখন পার্থক্যটা আনার চেষ্টা করছে। বাড়িটা শব্দহীন, এ-সময় কিছু শব্দ—যেমন বাসনকোসন বা রান্নার কিংবা এ-কাজ থেকে ও-কাজে ঘোরাফেরার—হতে পারত কাজের লোকটির মাধ্যমে, শব্দ না করে সে কোনো কাজ করতে পারে না, লোকটির বিরুদ্ধে শুভার এ প্রতিদিনের অভিযোগ। কিন্তু আজ, শুভার থাকা এবং না-থাকার মধ্যে পার্থক্যটা বুঝবার জন্যেই সম্ভবত, অনিমেষ তাকে কাজের এবং শব্দ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে। চা আনলেও চা-টা ঠাণ্ডা হতে দিয়েছে। লোকটি একবার এসে ঘুরে গেছে—অনিমেষ চা ছোঁয়নি পর্যন্ত। এই নির্লিপ্ত অন্ধকারে শুয়ে থাকা এবং রাতে খাবার ইচ্ছে নেই বলে আর কিছু না-বলা—এ-সবই ক্রমশ নৈঃশব্দ্যে ডুবিয়ে দেয় অনিমেষকে।

এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারে একমাত্র শুভা, যদি সে তার সাদা হাতের আঙুল তুলে চাপ দেয় কলিংবেলে এবং দরজা খোলার পর তার স্বাভাবিক হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কখন এলে?' বা আজ হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে, 'এ কী! ঘর-দোর এমন

অন্ধকার করে রেখেছ কেন?' অনিমেষ বলত, 'তোমার জন্যে'—। হয়তো বহুদিন পরে আজ সে আবার এ-কথা বলার সুযোগ পেত।

আজ সকালে শুভার 'জানি তো'-র পর আর কিছু না বলে রাস্তায় নেমে অনিমেষ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে পুরুষ-নারীর সম্পর্ক খুঁজতে শুরু করেছিল, তখন থেকেই এ বিষয়টা মাথায় এসেছে তার, কেন কে জানে—আকাশে তাকিয়ে সঞ্চরমান মেঘের ভিতর থেকে হঠাৎই যেমন চোখের সামনে নিঃশব্দে আবির্ভূত ছোট্ট উড়োজাহাজ, নীচে থেকে ধরা যায় না তার গতি ও স্পন্দন, তেমনি, হঠাৎ ধরা দিয়েছিল শুভার স্বাভাবিক হাসিমুখ। তারপর থেকে যতবারই শুভার সেই আলাদা কন্ঠস্বর ও বিষণ্ণ কঠোর মুখ মনে আনবার চেষ্টা করেছে অনিমেষ, ততবারই ফিরে এসেছে তার মুখশ্রী ও হাসি; যেন দীর্ঘ ছ'বছর সুখে, ভালোবাসায় পরিতৃপ্তিতে ও স্বামী-স্ত্রী থেকে যে-সুখ ও হাসি গড়ে উঠেছে অল্প অল্প করে, অনিমেষ তা ভুলবে কী করে! প্রায় তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল তার পিছনে হাঁটা—ঘুমে ছাড়া মানুষের পক্ষে আর কখনো যা সম্ভব নয়। কাল রাতে ও আজ সকালে যা ঘটেছে, বা আরো কয়েক দিন আগে থেকে যে-ঘটনার সূচনা হয়েছিল—সবই তার কাছে মনে হচ্ছিল স্বপ্ন, স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এটাও ভেবেছিল, এখন যে বিষয়টিকে সে স্বপ্ন বলে ভাবছে—গতকাল, এমনকি আজও, সকালেও, তা নিয়ে তেমন করে কিছু ভাবেনি। ভাবলে হয়তো সর্বনাশ এড়ানো যেত।

এ প্রশ্ন অনিমেষের, নিজের কাছে নিজের, এ প্রশ্নের জবাবও সে বহুবার পেয়েছে অভিজ্ঞতার কাছে। স্বপ্নেই কতবার সে লক্ষ করেছে শুভার নির্লজ্জ স্বেচ্ছাচারিতা—এই তো সেদিনও, যেদিন তারা শেষ শরীর বিনিময় করে, পর্দাহীন দরজার মতো নিজের প্রবল শরীরটা ছড়িয়ে দিয়ে সেখানে অন্য এক পুরুষকে ডেকে এনেছে শুভা; এ-সব দেখে ঘৃণা ও ক্রোধে শিউরে উঠেছে অনিমেষ। সে অবশ্যই একটা কিছু করার কথা ভেবেছে—যদিও কী করবে, কীভাবে শাস্তি দেবে শুভাকে, তার কোনো স্পষ্ট রূপ ধরা পড়েনি। প্রায় এই সময়েই ঘুম ভেঙে যায় তার—শুভা জড়িয়ে আছে তার নিজেরই শরীরে।

বুকভর্তি তার পৌরুষে, ঘন রোমের ওপর ঝরে পড়ছে শুভার নিঃশ্বাস। শুভার চোখ-মুখ-চুলে ঘুমের গন্ধ। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে অনেকদিনই মনে হয়েছে অনিমেষের, সে বোধহয় আরো একটু দিতে পারে শুভাকে—নিতেও পারে আরো অনেকদিন ধরে।

তাহলে—এত ভালোবাসার মধ্যেও—একজন বেশ্যা ও একটি জানোয়ার ঢুকে পড়ল কী করে ?

সারাদিন এই প্রশ্নের উত্তর পায়নি অনিমেষ, কোন কাজে মন দিতে পারেনি, অফিসে সময় কেটেছে অন্যমনস্কতার মধ্যে। এবং সে যে অন্যমনস্কতার মধ্যেই সময় কাটাচ্ছে এটা বুঝতে পারল দু'প্যাকেট সিগারেট ফুরিয়ে যাবার পর যখন সে আবার সিগারেট চাইল বেয়ারার কাছে এবং বেয়ারা নতুন একটা প্যাকেট তার হাতে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, 'আজ এত সিগারেট খাচ্ছেন ?' অনিমেষের কথাটা ভালোভাবে না শুনেই বলল, 'খাচ্ছি—।' অর্থাৎ এ কথারও সঠিক উত্তর তার মনে ছিল না। সে শুধু ভাবছিল শুভার কথা, অন্য কোনো কথা না ভেবে। ততক্ষণে দু'টি মাত্র কথা—'জানি তো', জায়গা বদল করে নিয়েছে তার হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে। তবু আত্মরক্ষার সহজতম উপায়টি বার বার এড়িয়ে গেছে সে। একবারও বাড়ি ফিরে যাবার চেষ্টা করেনি।

বিকেলে, বহুদিন পরে অভ্রকে একা পেয়ে এগিয়ে গিয়ে কথা বলল অনিমেষ। অফিসে অল্পস্বল্প হাসাহাসি শুরু হবার পর থেকেই মেয়েটিকে এড়িয়ে যাচ্ছিল সে।

অভ্র অবাক। টাইপ-করা চিঠি নিয়ে সই করাতে যাচ্ছিল বস-এর ঘরে, অনিমেষের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে হেসে বলল, 'তাহলে তুমি আমাকে সত্যিই ঘেন্না করো না—!'

অনিমেষ 'সে কী !' বলতে যাচ্ছিল। তখনই চোখ পড়ল অভ্রর শরীরে। অভ্রর গা থেকে বেরুনো প্রায় লুপ্ত এসেন্সের গন্ধ এসে লাগল নাকে। সামলে নিয়ে শোনার জন্যে উৎসুক গলায় অনিমেষ বলল, 'তুমি কি রাগ করেছ ?'

'আই লাভ ইউ, ডিয়ার।'

সে সময় বস-এর ঘর থেকে পিওনকে বেরুতে দেখে তাড়াহুড়ো

করে সরে গেল অভ্রি। অনিমেষ, কেন কে জানে, অভ্রির ফিরে আসার অপেক্ষায় আরো কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়েছিল।

অন্ধকার বিছানায় উঠে বসল অনিমেষ। সকাল থেকে, শুভার থাকা ও না-থাকার মধ্যে পার্থক্যটা এখন ধরা পড়ে—শুভার অভাব এখন মন থেকে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে শরীরেও। শুভার জন্যে সে কি আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে?

এখন ঠিক মনে পড়ছে না, ঘোরতর অবিশ্বাসের মধ্যে অনিমেষ হঠাৎ ভাবল, সে কি শুভাকে চলে যেতে বলেছিল?

পিসতুতো দিদির নাম দূর্বা। শুভার চেয়ে বেশ বড় বয়সে, সম্ভবত অনিমেষের চেয়েও। বড় সামাজিক প্রতিষ্ঠায় এবং পয়সাতেও। অনিমেষ সাধারণত এড়িয়ে চলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানে, দূর্বা শুভাকে একটু বেশিই পছন্দ করে—স্নেহ আছে, শুভার ও-বাড়িতে যাতায়াতের ব্যাপারটা লক্ষ করলেই বোঝা যায় সেটা। শুভার স্বামী বলে অনিমেষও দূর্বার কাছে কম পছন্দের নয়।

গড়িয়াহাট রোডে দূর্বাদের ফ্ল্যাটে অনিমেষ যখন কলিং বেল টিপল তখন দশটা পাঁচ। মধ্যবিত্ত হিসেবে একটু বেশি রাত। দূর্বার স্বামী তখনো ফেরেনি। দূর্বাও বেরিয়েছিল হয়তো, ফিরেছে একটু আগে—সেটা বোঝা যায় তার প্রসাধন পারিপাট্য লক্ষ করলে। বাড়ি ফিরে দূর্বা মাত্র কাপড়টাই ছাড়বার সুযোগ পেয়েছিল, বলল, 'আ-রে তুমি! এসো, এসো। শুভা আসেনি?'

অনিমেষ মাথা নাড়ল। শুভা যে এখানে আসেনি বা থাকবে না—এটা সে আগেই জানত। অনুসন্ধানে বেরিয়েও সে পরিষ্কার বুঝে ফেলেছিল, অভিমান নিয়ে শুভা কোনো পরিচিত আশ্রয়ে যাবে না। তাতে বিষয়টার গুরুত্ব নষ্ট হতে পারে। শুভার পরিচিত জায়গাগুলির সঙ্গে অনিমেষের যা দূরত্ব, তার চেয়ে বেশি দূরত্ব শুভা অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারে কোথাও না গিয়ে, বাড়িতেই থেকে। এ ক'দিনেই কি সেরকম কিছু পারেনি! ছ'বছরের দাম্পত্য জীবনে অনিমেষের অজ্ঞাতসারে যে কোথাও যায়নি, একবার গেলে সে নিশ্চিত সহজে ফিরবে না। বস্তুত, পরে বিশ্লেষণ করে শুভার ওই দুটি কথা, 'জানি তো'-র মধ্যে অনিমেষ রহস্য খুঁজে পেয়েছিল। সামান্য

আত্মবিশ্বাসও। তবু, দীর্ঘক্ষণ শুভার অপেক্ষায় বাড়িতে থাকার পর, ঘরের অন্ধকার দেওয়ালে তার ও শুভার ছবির দিকে তাকিয়ে হঠাৎই বুক কেঁপে উঠেছিল অনিমেষের—কিছু করে বসেনি তো? বলতে কি, ভাবনাটা মাথায় আসার পর থেকেই সে স্থির থাকতে পারেনি আর। এখন, রাত দশটারও পরে, সে দূর্বার সামনে দাঁড়িয়ে।

স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় অনিমেষ বলল, 'এদিকে এসেছিলাম। ভাবলাম দেখা করে যাই—'

'ভালো করেছ। আমি আজকালের মধ্যেই তোমাদের ওখানে যাবো ভাবছিলাম।' দূর্বা বলল, 'শুভা কি আসবে?'

'বলছিল তো—।' অনিমেষ এড়িয়ে যেতে চাইল, দূর্বার কথা থেকে কথা খুঁজে নিল, 'দেখুন দু' একদিনের মধ্যেই এসে পড়বে হয়তো। যা বৃষ্টি গেল!'

'তাহলে আমি আর যাবো না। ওকে তুমি বোলো তো, পার্ক হোটেলে একটা শাড়ির একজিবিশন হচ্ছে, নিয়ে যাবো।' দূর্বা বলে গেল, 'কাল পারব না। কবে আসবে, পরশু?'

দূর্বা ভিতরে গেল, এখন চা, কফির ব্যবস্থা করবে। ক্ষুধার্ত অনিমেষের কাছে এখন শুভার প্রত্যাবর্তনের চেয়ে বড় খাদ্য আর কিছুই নেই। শুভা ছিল, ভালোবাসা ছিল—কিংবা সমস্ত আড়াল করে রাখা এক ধরনের পরিপূর্ণতা, শুভার অভাবে সবকিছু আজ অর্থহীন লাগছে।

তবু দূর্বার সামনে বসে কফিতে চুমুক দিয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল অনিমেষ! দূর্বাকে বলেছে 'এদিকে এসেছিলাম—', তাই, এখানের অবস্থান দীর্ঘ না হবারই সম্ভাবনা। একা অনিমেষকে দূর্বা নিশ্চিত আরো কিছুক্ষণ বসে যাবার জন্যে জোর করবে না। করলেও, চমৎকার অভিনয়ে সে নিশ্চিত এড়িয়ে যেতে পারবে। এর আগে সে আরো দুটো অভিনয় সেরে এসেছে।

এমনও হতে পারে—বাড়িতে অধৈর্য হতে হতে অনিমেষ এক সময় ভেবেছিল, আজকের মানসিক অবস্থায় শুভা কোথায় যাচ্ছে তা জানিয়ে যেতে ভুলে গেছে। এমনও হতে পারে, ইচ্ছে করেই জানায়নি

সে ; এতদিন জানাতো অনিমেষের কথা ভেবেই, আজ সে প্রয়োজন কোথায় ? ইত্যাদি চিন্তা নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়, অনিমেষ নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। বেরুবার আগে আলো জেলে সে প্রতিটি সম্ভাব্য জায়গা খুঁজে দেখেছিল শুভা কিছু লিখে রেখে গেছে কিনা। কোথাও কিছু নেই ; পরিবর্তে চোখে পড়ল আলনা জুড়ে শুভার শাড়ি ও তার নিজস্ব জিনিসপত্র, দেওয়ালে তাদের দুজনের ও শুভার একার ছবি—একা অবস্থাতেও তাকে নিজের স্ত্রী বলে চিনতে অসুবিধে হলো না। প্রায় তখন থেকেই শুভকে খুঁজতে বেরিয়েছে অনিমেষ। কোনো ঠিকানা না নিয়ে—চেনাশোনা কোথাও শুভা যাবে না অনুমান করে নিয়েও। রাস্তায় নেমে এর আগে কোনো- দিনও শহরটাকে তার এত অপরিচিত লাগেনি।

দূর্বাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এলো অনিমেষ। একা। ঘড়ি দেখল, সাড়ে দশটা। রাস্তায় লোকজন কমে এসেছে, ক্বচিৎ ট্রাম ও বাস দিনশেষের যাত্রীদের খুঁজে খুঁজে এখনো পেঁাছে দিচ্ছে গন্তব্যে। রাত বেড়ে-ওঠার একরকম চেহারা আছে—যেন এই প্রথম ব্যাপারটা বুঝল অনিমেষ এবং অন্যমনস্ক দাঁড়িয়ে ভাবল, সে কি এখন বাড়ি ফিরে যাবে ?

খুব আশ্বস্ত হতে পারল না অনিমেষ। চিন্তাটা দু'দিকে টানতে লাগল তাকে—শুভা হয়তো ফিরে এসেছে এতক্ষণে, ফিরেছে কি ? শেষের প্রশ্নে অল্প কেঁপে উঠল সে, যদি না ফেরে !

দূর্বা কিছু বুঝতে পারেনি। অনিমেষের আকস্মিক আবির্ভাব, কথা প্রায় না-বলা ও তারপর আবার হঠাৎ চলে আসায় সামান্যতম ব্যতিক্রম লক্ষ করেনি দূর্বা, যাতে অন্তত চকিত সন্দেহও দেখা দেয়। অনিমেষ মিথ্যা বলেছিল, তবু তার চোখমুখ কি এতই রূপান্তরহীন যে শুভার জন্যে এতটুকু উৎকণ্ঠা ধরা দেয়নি ! আলাদা করে ভেবে সে নিজেও অবশ্য অবাক হচ্ছে, অভিনয়টা চমৎকার হয়েছিল, না হলে দূর্বার চোখে নিশ্চিত ধরা পড়ত। নীলিমাদি ধরেছিল। শুভার সন্ধানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে প্রথম নীলিমাদির কাছেই যায়, খোঁজ করে—এমনভাবে, যাতে সত্যিই কোনো উদ্বেগ প্রকাশ না পায়।

'আশ্চর্য তো !' নীলিমাদি বলল, 'সকালে বেরিয়েছে, এখনো

ফেরেনি—কোনো খবরও রেখে যায়নি!' বলে থামল একটু, 'অনিমেষ, ঝগড়া টগড়া করোনি তো?'

'না,'— কণ্ঠস্বর নিজের কানেই একটু আলাদা শোনাতে অনিমেষ শুধরে নিয়েছিল তাড়াতাড়ি, 'ঝগড়া করে কেউ বাড়ি ছেড়ে যায় না—'

'বাড়ি ছাড়ার কথাটা হঠাৎ মনে এলো কেন বলো তো?'

এই একটা প্রশ্ন, আচমকা, যার উত্তর অনিমেষের কাছে ছিল না। কাছাকাছি থেকে নীলিমাদি হয়তো একটু বেশিই চিনেছিল শুভাকে। খুব সাবধানে এ-কথার উত্তর না দিলে সম্পূর্ণ দোষ এসে পড়বে তার ওপর—যদিও ব্যাপারটা ভুল নয়, শুভা যদি চলে যাবার কথা ভেবে থাকে, সে তো তারই জন্যে! কথাটা এড়িয়ে গেল সে।

'ওসব কিছু নয়। দেখি ভবানীপুরে গেছে হয়তো—'

অনিমেষ চলে যাচ্ছে, নীলিমাদি বলল, 'কদিন দেখে মনে হচ্ছিল ওর মনটা ভলো নেই। ফিরে এলে একটা খবর দিও—'

শুভা ফিরে এলে খবরের গুরুত্ব থাকবে না কোনো, তখন এমনিতেই সহজ হয়ে আসবে ব্যাপারটা। শুভা ফেরেনি, অনিমেষ তাকে খুঁজে ব্যর্থ হয়েছে, নীলিমাদি সম্ভবত এই খবরটাই চায়, অনিমেষ ভাবল। বস্তুত, তখন থেকেই সতর্ক হতে শুরু করেছিল সে—হোক সে অপরাধী, শাস্তি পাবার আগে সে শুভাকে ফিরে পেতে চায়। মনে হয়, একটা খবরের জন্যে, অনিমেষকে অপরাধী প্রমাণ করার জন্যে, কেউ আড়াল দিয়ে রেখেছে শুভাকে—তাদের সকলের উদ্দেশে অনিমেষের কিছু বলবার আছে। সে বলতে চাইছিল, এই মুহূর্তে শুভার অভাবে সে পুনর্জীবন লাভ করেছে, ফিরে এলে শুভা হয়তো আর পরিচিত অনিমেষকে খুঁজে পাবে না। কেউ কি তা বুঝবে! এখন যা পাচ্ছে তার চেয়ে বেশি শাস্তি সে আর কী পেতে পারে!

ভবানীপুরে যাবার জন্যে বাসে উঠেও মাঝে রাস্তায় নেমে পড়ল অনিমেষ। সামনে একটা ওষুধের দোকান। ফোন করল।

'শুভা কি গেছে ওখানে?'

'কই, না তো!' শুভার মা'র গলা চিনল অনিমেষ, 'কোত্থেকে

-বলছ ?'

'অফিস থেকে—।' অনিমেষ দেখল সে ঠিক-ঠিক এড়িয়ে যেতে পারছে। বলল, 'যাবে বলেছিল, থাকলে আসতাম। আচ্ছা—'

'শোনো, অনিমেষ—'। এ-পর্যন্ত শুনে আর না-শুনে, ফোনটা নামিয়ে রাখল অনিমেষ। শুভা যায়নি, এটুকুই তার জানার ছিল, সে আর কিছু জানতে চায় না। এই পর্যন্ত তার আশঙ্কার মধ্যেও ছিল শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, ফোনটা নামিয়ে রাখার সময়েই অনুভব করল হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়েছে, হঠাৎই সে হারিয়ে ফেলছে নিজেকে—আশ্বাস থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছে দূরে। আগেই ভেবেছিল, এই যাওয়ার সঙ্গে শুভার সেই স্বর, 'জানি তো'র যদি কোনো সম্পর্ক থেকেও থাকে, তাহলে সে পরিচিত আশ্রয়ে যাবে না। ভাবলেও একটা ক্ষীণ আশ্বাস সে ধরে রেখেছিল এতক্ষণ, দূর্বাকে ধরে এই তিনটি জায়গার যে-কোনো একটিতে নিশ্চিত খুঁজে পাবে শুভাকে। বলবে—

দূর্বার বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্যমনস্ক ঘুরতে ঘুরতে ভগ্ন, পরিশ্রান্ত অনিমেষ কখন যে বাড়ির দিকে চলে এসেছে খেয়াল করেনি ; খেয়াল হতেই পর্যুদস্ত বোধ করল সে। সম্ভবত ব্যর্থতাই অন্যমনস্কতার ভিতব ভুল রাস্তায় চালিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে—নাকি ইতিমধ্যেই কোনো এক সময় সে ভেবেছিল, এখন বাড়ির দিকেই যাবে, যতই অভিমান থাক, শুভা কি বুঝবে না অপরিচিত এই শহরে এখনো তবু অনিমেষ আছে! মাত্র কয়েকটা দিনের ঘটনা, একটি রাতের স্মৃতি কি দীর্ঘ ছ'বছরের একাত্ম সম্পর্ক মুছে দিতে পারে!

দরজার কলিং বেলে হাত রেখে অনিমেষ শুনল বাড়ির ভিতরে কেঁপে কেঁপে ছুটে যাচ্ছে একটা তীক্ষ্ন ধাতব শব্দ—যেন তার নিজেরই অনুভূতি ও রক্ত বিদ্যুতে সঞ্চারিত হয়ে ঘোষণা করছে নিজেকে। বয়স বেশি নয়, স্বভাবে সরল আর চাতুর্যহীন শুভার পক্ষে এত রাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকা উচিত নয়, বিপদ আছে। এইভাবে যাওয়ার অর্থ—শুভা কি জানে না—ফিরে আসার সম্ভাবনা থেকে ক্রমশ নিজেকে আরো দূরে নিয়ে যাওয়া! অনিমেষ তখন কোথায় দাঁড়াবে? দরজা খোলার আগে সে ভাবল, এমন কি হতে পারে অনিমেষের জন্যে কোনো সম্ভাবনাই রাখেনি শুভা, সে

আত্মহত্যা করেছে !

'ফেরেনি ?'

'না—'

বাড়ির ভিতর এখনো আলো আছে ; তবু যতদূর চোখ যায় অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না অনিমেষ। ধীর পায়ে সে এগিয়ে গেল সেই ঘরের দিকে, কাল রাতের অভিজ্ঞতায় যেখানে তারা, স্বামী-স্ত্রী, বেশ্যা ও জানোয়ারের যুদ্ধ দেখেছিল। অন্ধকার ঘরে একা ; অস্তিত্বহীন দাঁড়িয়ে থাকে সে। টের পায় রক্তে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে শুভার শরীরের গন্ধ, তীব্র আমিষ গন্ধে ফেঁপে ওঠে আপাদমস্তক। অবিমিশ্র যৌনতায় বহুক্ষণ পরে আবার কাতর হয়ে পড়ে অনিমেষ।

অনেক বেশি রাতে পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ঝুঁকে পড়ে অনিমেষ ; ভারসাম্যহীন শরীরে এখনো সে বয়ে বেড়াচ্ছে শুভার অভাব—খুব স্পষ্টভাবে না হলেও, এখনো শুভা লেগে আছে তার শরীরে। প্রায় অর্ধনারীশ্বরের মতো কিম্ভূত অস্তিত্ব নিয়ে হাঁটছে সে—বিপর্যস্ত ও যৌনকাতর ; সম্ভবত সে এবার একটা ট্যাক্সিতে উঠবে। ঠিক মনে করতে পারে না কেন সে অবশেষে পুলিশে ডায়রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল—শুভার ভার কি খুব বেশি বোধ হচ্ছিল ? হতে পারে, নাও হতে পারে—অনিশ্চয়তা থেকে অনিমেষ কোনো সিদ্ধান্ত বা গন্তব্যে পৌঁছুতে পারছে না—কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম কোনো বিশ্বাসে, এলেমেলো পা ফেলছে মাত্র।

শুভা কি ফিরবে ? এক-একবার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে ফিরবে—নিশ্চিত কারণহীন যারা এই ভাবে চলে যায় তারা, পুলিস আশ্বাস দিয়েছিল তাকে. সাধারণত নিজে থেকেই ফিরে আসে। অনিমেষ তিনটি আশ্রয়ের কথা ভেবেছিল। অনিমেষ কি ঠিক জানে এগুলো ছাড়া শুভার আর কোনো আশ্রয় নেই, অনিমেষের আক্রমণ থেকে বহু দূরে যেখানে সে নিশ্চিন্তে আত্মগোপন করে থাকতে পারে ?

মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রায় শাসনের ভঙ্গিতে একটি ট্যাক্সি থামায়

বিপর্যস্ত অনিমেষ, উঠে পড়ে। অনেক দূরে কোনো এক জায়গায় আছে তার ছ'বছরের পুরনো বাড়ি, যা আসলে তার ও শুভার বাড়ি। শুভা না-ফেরা পর্যন্ত সেই অসম্পূর্ণ সহাবস্থানের ভিতর একা কী করে ফিরে যাবে সে!

ট্যাক্সির নিরাপত্তায় বসে একে একে অনেকগুলো রাস্তা পেরিয়ে যায় অনিমেষ। কলকাতা নিঝুম হয়ে আসছে, খানিক আগেই ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে নিঃসঙ্গ কুকুরের অর্থহীন ডাক শুনেছিল। আর সবই স্তব্ধ। এই সময়ের অন্ধকারে আছে এক বিশিষ্ট গন্ধ, হাওয়ায় একরকম প্ররোচনা। শুভা যেখানেই থাকুক, নিশ্চিত টের পাবে।

যাবে কি যাবে না ভেবে অনিশ্চিত, ইলিয়ট রোডে ট্যাক্সি থেকে নেমে অনিশ্চিত ভঙ্গিতেই কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায় অনিমেষ। অদ্রির দরজায় বেল নেই। টোকা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হয় তাকে। দরজা খুলল।

'গস্! ইউ! অনিমেষ!'

অদ্রির পরনে নাইটি ছাড়া আর কিছু নেই। তার একা ফ্ল্যাটের নীলাভ আড়ালে এইমাত্র ছড়িয়ে পড়েছে এতক্ষণ ধরে সঙ্গে বয়ে আনা গন্ধ ও হাওয়া। অনিমেষ তাকে দরজাটা বন্ধ করার সুযোগ দিল। 'আই লাভ ইউ, ডিয়ার', মনে পড়ল কী বলেছিল বিকেলে। সকালে অফিসে বেরুনোর পর থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত এই কথাটা নিষ্ফল ভাবে সে বলে গেছে শুভাকেও। অদৃশ্যের যদি কোনো সংযোজক ক্ষমতা থাকে, যেখানেই থাকুক, শুভা তা শুনতে পাবে।

ভাবতে ভাবতে প্রকৃত জানোয়ারের একাগ্রতায় অদ্রিকে কাছে টেনে নিল অনিমেষ।

তৃতীয় ব্যক্তি

অফিস থেকে গম্ভীর হয়ে বাড়ি ফিরল সুকান্ত। জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমে যেতে যেতে বলল, 'তাড়াতাড়ি চা দাও। আমি একটু বেরুব।'

খাটে বসে ব্লাউজের ছিঁড়ে যাওয়া হুক্ মেরামত করছিল তারা। সুকান্ত না বললেও সে নিজেই যেত চায়ের যোগাড়ে! যেমন রোজই যায়। বেরুবে শুনে ছুঁচ-সুতো ধরা হাতটা থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই তো ফিরলে! এখনই আবার কোথায় যাবে?'

সুকান্ত ততক্ষণে বাথরুমে ঢুকেছে। দরজা বন্ধ করতে করতে কী বলল তারা শুনতে পেল না। অগত্যা হাতের কাজ রেখে সে চায়ের জল চাপাতে ছুটল। সুকান্তর স্বভাব তার অজানা নয়। এমনিতেই ব্যস্তবাগীশ, কাজে অকাজে সব সময় তাড়া দেয়, পান থেকে চুন খসলে গোলমাল বাধায়। তারপরেও এমন হয়, সুকান্তর যে-কাজের জন্যে তাকে হিমসিম খেতে হলো সেই কাজটাই পড়ে থাকে। মাঝখান থেকে তাকেই শুধু ব্যতিব্যস্ত হতে হয়।

সুকান্ত বাথরুম থেকে বেরুলে খাবার, চা এগিয়ে দিল তারা। সময় নিয়ে বলল, 'ধীরেন এসেছিল একটু আগে—'

'কোন ধীরেন?'

'তোমার অফিসের। চিনলে না!'

'ও।' কথাটায় তেমন আমল দিল না সুকান্ত। চা-টা শেষ করতে করতে বলল, 'তার আবার কী দরকার! অফিসেই তো দেখা হলো!

'কী দরকার আমি কী করে বুঝব!'

সুকান্ত আর কিছু বলল না। আবার ব্যস্ত হলো পোশাক পাল্টাতে। তারা লক্ষ করল, শুধু গম্ভীরই নয়, অফিস থেকে এক ধরনের অন্যমনস্কতাও নিয়ে ফিরেছে সুকান্ত। দাম্পত্য-সম্পর্ক কিছু-

কিছু অভ্যাস এনে দেয় স্বামী-স্ত্রীর আচরণে, এই মুহূর্তেও সেই অভ্যাসই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সুকান্তকে।

ব্যাপারটা ক্ষুব্ধ করে তুলল তারাকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতি নিবিষ্ট সুকান্তকে লক্ষ করতে করতে বলল, 'তুমি কি সত্যিই বেরুচ্ছ ?'

'বললাম তো !'

'কোথায় ?'

'একবার নীলিমার খোঁজ করে আসি। আজ অফিসে যায়নি। বোধহয় আবার কোনো বিপদে পড়েছে—'

চুল আঁচড়ানো শেষ করে রুমাল ও মানিব্যাগ পকেটে ভরল সুকান্ত। সম্ভবত এবার জুতো পরার দিকে এগোবে।

'নীলিমার খোঁজে তোমার কী দরকার !' তারা বলল, 'অধীর তো ফিরে এসেছে !'

'কে বলল ! ধীরেন ?'

তারা জবাব দিল না। খবরটা সে ধীরেনের কাছেই পেয়েছে, এটা বুঝতে সুকান্তর অসুবিধা হবার কথা নয়।

নতুন কোনো প্রশ্নে গেল না সুকান্ত। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ঘড়ি দেখল। তারপর বলল, 'অধীরকে বিশ্বাস কী ! বিয়ের পর থেকেই দেখছি নীলিমাকে ট্রাবল দিচ্ছে। আবার কী ঝামেলা বাধায় ঠিক কী !'

জবাবটা খুশি করল না তারাকে। বিরক্ত গলায় বলল, 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মানে কি বুঝি না ! তোমাকেই বা রোজ রোজ নীলিমার কাছে যেতে হবে কেন ! ওরা কিছু ছেলেমানুষ নয়। সোমত্ত মেয়ে পুরুষ। ওদেরটা ওরাই বুঝে নিক।'

'অত চ্যাঁচাচ্ছ কেন !' জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে আড়ে স্ত্রীকে দেখল সুকান্ত। থেমে বলল, 'নীলিমার বিয়েটা আমিই দিয়েছিলাম। ওর প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে—'

'দায়িত্ব !' শ্লেষ ফুটল তারার গলায়, 'হ্যাঁ, তা বইকি ! দায়িত্ব-জ্ঞান টনটনে। একটা বদ মেয়ের জন্যে দরদ তো থাকবেই !'

'চুপ করো ! অসভ্যের মতো কথা বোলো না।'

'আমি কিছুই বলতে চাই না। লোকে বলছে—'

'কে কী বলেছে! ধীরেন?'

'অত জানবার কী আছে! যেখানে যাচ্ছ যাও। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না হয়—'

'তারা!' হঠাৎ বিশ্রীভাবে ধমকে উঠল সুকান্ত। সোজাসুজি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নিজের জায়গাতেই থেমে থাকল কিছুক্ষণ। যা বলতে চায় তা না বলে দাঁত চাপা দিল ঠোঁটে, 'যাকে ঘেন্না করো তার সঙ্গে থাকার কী দরকার? চলে গেলেই পারো!'

'আর থাকব না। তোমার ওইসব বদ খেয়াল আমি আর সহ্য করব না।'

বলতে বলতে দ্রুত সামনে থেকে সরে গেল তারা। বোধহয় রান্নাঘরের দিকে।

সুকান্ত যে খুব চিন্তিত হলো তা নয়। রাগটাই বেশি। শীত-শেষের সন্ধের এই নরম আবহাওয়াতেও উত্তেজনায় ঘাম ফুটল কপালে। আর অপেক্ষা না করে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। কুয়াশা না থাকলেও চারদিকে কেমন একটা ধোঁয়াশা ভাব। তারার সঙ্গে কথা কাটাকাটির পর রাস্তায় এসে এখন নিজের মাথার ভিতরেও একটা গোলানো অনুভূতি টের পাচ্ছিল সে। ওইভাবেই এগিয়ে গেল বাসস্টপের দিকে। ঠিকঠাক বাস না পেলে ট্যাক্সি নেবে।

সম্ভবত একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ইচ্ছে করলেই হয়তো তারার সঙ্গে এই মনোমালিন্য এড়ানো যেতো। এটা ঠিক, বেশ কিছুদিন ধরেই তারার প্রতি সে যথেষ্ট মনোযোগী হয়ে উঠতে পারছে না, সুকান্ত ভাবল, কেমন একটা বাধা আসছে মনে। নীলিমাদের অশান্তিটা শুরু হবার পর থেকেই এরকম। এতদিন মুখ ফুটে কোনো অনুযোগ না করলেও ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিল তারা; আজকের ঘটনা ও কথাবার্তাই তা স্পষ্ট করে দিল। অথচ একটু মন খুলে ভাবলেই তারা বুঝতে পারত, সুকান্তর এই যাওয়া—নীলিমার খোঁজখবর নিতে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই নীলিমা ও অধীরের মধ্যে একটা গোলমাল শুরু হয়েছে—কথাটা তারা-ই প্রথম বলেছিল তাকে।

সুকান্ত তেমন গুরুত্ব দেয়নি, তার সঙ্গে মেলামেশায় নীলিমার কোনো পরিবর্তন লক্ষ করেনি। তারা বলেছিল, 'অধীরকে একটু খুঁচিয়ে দ্যাখো না ব্যাপারটা কী!'

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে ঘটনাগুলো আগাগোড়া ফিরিয়ে আনতে পারল সুকান্ত। ব্যাপারটা যে সহজ নয় তা বুঝেছিল কিছুদিনের মধ্যেই। একই অফিসে কাজ করতে করতে ট্রান্সফার চাইল অধীর, না পেয়ে অফিসে আসা বন্ধ করল। তারপর হঠাৎই একদিন বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হলো। জিজ্ঞেস করতে নীলিমা বলল, 'ওর ব্যাপার ওই জানে। যাবে আর কোথায়! ওর যে এমন সন্দেহ বাতিক আগে তা বুঝতে পারিনি।'

'সন্দেহ বাতিক! কাকে সন্দেহ?'

নীলিমা ভাঙলো না। খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি জেনে কী করবেন!'

কী যেন ছিল নীলিমার কথায়। ওর মুখ চোখ দেখেও সুকান্তর মনে হয়েছিল মুখ ফুটে কিছু না বললেও মেয়েটি শান্তিতে নেই। ভরসা চায়। সম্ভবত তারই কাছে। অফিস থেকে দূরে, রেস্তোরাঁয়, হঠাৎই ওর হাতে নিজের হাতের চাপ দিয়ে সুকান্ত বলেছিল, 'ভেঙে পড়ার কী আছে! আমরা তো আছি!'

বাস্তবিক, আমরা বলতে সেদিন সে কী বুঝিয়েছিল? না কি একা হাতের স্পর্শেই শব্দটার অর্থ পাল্টে দিতে চেয়েছিল সে, ভেবেছিল নীলিমা বুঝবে!

আস্তে হাতটা সরিয়ে নিয়েছিল নীলিমা। কিছু বলেনি। কেন কে জানে, সেদিন থেকেই মেয়েটির প্রতি একটা অস্পষ্ট টানে জড়িয়ে পড়েছিল সুকান্ত।

মিনিট পনেরোর রাস্তায় প্রায় সারাক্ষণই নিজের চারপাশে জাল বুনে গেল সুকান্ত। নীলিমা-অধীরের সম্পর্কের জটিলতা খুঁজতে গিয়ে এবং তার মধ্যে সে ঠিক কোন ভূমিকা পালন করছে তা বুঝবার চেষ্টায় নিজেরই ধন্দে জড়িয়ে পড়ল সে, বুঝতে পারল না তার এবং তারার মধ্যে সম্পর্কটাও বস্তুত কী রকমের! যে-ভাষায় ও ভঙ্গিতে আজ সে ও তারা পরস্পরকে আঘাত করল, তা কি স্বামী-স্ত্রীর

সম্পর্কের মধ্যেই পড়ে ? এরপর যখন সে বাড়ি ফিরবে তখন কীভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হবে দুজনে ! অথচ নীলিমার সঙ্গে পরিচয়ের মূলেও ছিল তারা। না হলে এক অফিসে কাজ করতে করতে নীলিমাও আর পাঁচজনের মতো শুধুই একজন সহকর্মী হয়ে থাকতে পারত।

সেবার বারাসতে অফিস পিকনিকে তারাকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল সুকান্ত। তারপর যা হয়, বহুদিন পরে দুই বন্ধু মুখোমুখি। তারা বলল, 'নীলা যে তোমাদের অফিসে কাজ করে, কোনোদিন বলোনি তো ?'

'অফিসে তো অনেক মেয়েই কাজ করে।' কিছুটা বিব্রত হয়ে বলল সুকান্ত, 'কী করে বুঝব কোনজন তোমার কলেজের বন্ধু কোনজন নয়।'

নীলিমা হেসে বলল, 'আর নিশ্চয়ই অনেক মেয়ের মধ্যে থাকব না !'

সত্যিই তা থাকেনি নীলিমা। স্ত্রীর বন্ধু বলেই হয়তো মেয়েটিকে একটু বেশি পছন্দ করেছিল সুকান্ত।

এ ব্যাপারে ঢাকাঢাকি ছিল না কোনো। দুজনের সেকশন আলাদা, তবু, আকস্মিকভাবে প্রায়ই দেখা হয়ে যেত দুজনের। হাসিঠাট্টাও বাদ পড়ত না। ছুটির পরেও কোনো কোনোদিন ওরা একসঙ্গে হেঁটে গেছে ট্রাম লাইন পর্যন্ত। এমনকি, প্রায়ই সুকান্তর সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত চলে আসত নীলিমা।

তারা একদিন অনুযোগ করল, 'ও এত ঘন ঘন আসে কেন বলো তো ?'

'আমি কী করে বলব !' হাল্কা গলায় বলেছিল সুকান্ত, 'তোমারই তো বন্ধু !'

'আদিখ্যেতা ভালো লাগে না।' তারার বিরক্তি অস্পষ্ট থাকেনি, 'অফিসের আলাপ তুমি অফিসেই সেরে এসো। ও যেন আর বাড়িতে না আসে।'

শেষের কথাগুলো প্রত্যাশিত ছিল না। তারার শাসন হঠাৎই ডুবিয়ে দিল সুকান্তকে। সামলে নিয়ে বলল, 'ঘটকালি করছি। একটা

হিল্লে হয়ে গেলে ও আর আসবে না। নিজের ঘর থাকলে কে আর সাধ করে পরের ঘরে আসে!'

সুকান্ত মিথ্যে বলেনি। জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতার অফিসে বদলি হয়ে এসেছিল অধীর পুরকায়স্থ। একেবারে ঝাড়া হাত-পা যুবক। নীলিমার জন্যে ওকে পাকড়াও করল সে। বিয়ে দিল ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে।

তারা খুশিই হয়েছিল। হয়তো আপদ বিদায় হলো ভেবে।

এতদিন পরে এইসব মনে পড়ায় সুকান্ত নিজেই অবাক হয়ে যায়। নীলিমাকে নিয়ে এত কথা সত্যিই তবে তাদের মধ্যে হয়েছিল! যেটা ভেবে পেল না, বিয়ের পর নীলিমার এ বাড়ি আসা বন্ধ হলেও, সে কেন নিজেকে সরিয়ে নিতে পারল না! নীলিমা কোনোদিন মুখ ফুটে না বললেও কেন তার বারবার মনে হয় বিয়ের পর তার ওপর নীলিমার নির্ভরতা বেড়েছে বই কমেনি!

নীলিমাদের রাস্তায় বাঁক নেবার মুখে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল সুকান্ত। পুরনো স্কুল-বাড়িটা বাঁ হাতে রেখে বাঁক ঘুরলে নীলিমাদের ফ্ল্যাট। ওদের বিয়ের কথা পাকা হবার পর এই ফ্ল্যাটের খবর সুকান্তই এনে দিয়েছিল। অধীর ঠাট্টা করে বলেছিল, 'জোয়াল তো তুলে দিলেন ঘাড়ে, টানতে পারব তো!'

সুকান্ত বলেছিল, 'ঘাড় শক্ত দেখেই তো দিলুম। দেখি কী হয়!'

'না পারলে আপনাকে মদত দিতে ডাকব।'

তখন অন্যরকম ছিল অধীর। আজকের গেলমালের আভাস সেদিন ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যায়নি।

সুকান্ত ঠিকই করে ফেলেছিল অধীরের সঙ্গে দেখা হলে আজ সে দু'চার কথা শোনাবে। অধীরের বোঝা দরকার, জোর আছে বলেই নীলিমার সঙ্গে যথেচ্ছ দুর্ব্যবহার করা তার পক্ষে অনুচিত। সে যেন ভেবে না নেয় যে নীলিমা একেবারেই একা অসহায়।

দরজা খুলল অধীরই। সুকান্তকে দেখে একটু অবাক হলো যেন, চোখমুখের চাপা বিরক্তির ভাবটুকু লুকোতে পারল না।

'আপনি!'

'হ্যাঁ।' সুকান্ত বলল, 'খুব অবাক হয়েছ মনে হচ্ছে!'

'একটুও না।' অদ্ভুতভাবে হাসল অধীর। তারপর ভিতরে যেতে যেতে বলল, 'বসুন। ওকে খবর দিচ্ছি—'

অন্যদিন সুকান্ত সরাসরি ভিতরে চলে যায়। কী ভেবে আজ বাইরেই বসল। মনে মনে একরকম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল সে। এমনও মনে হলো, অধীর সদ্য ফিরে এসেছে, আজ সে না এলেই হয়তো ভালো করত।

অধীর ফিরে এলো। পায়ে রবারের স্লিপার বদলে চপ্পল পরেছে। না তাকানোর মতো করেই এক পলক সুকান্তর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বসুন। ও আসছে। আমি একটু বেরুচ্ছি—'

অধীরের কথা বলার কাটা-কাটা ভঙ্গিটুকু কান এড়ালো না সুকান্তর। অধীর কি তার মুখোমুখি হতে সাহস পাচ্ছে না!

নিজেও উঠে দাঁড়িয়ে সুকান্ত বলল, 'তোমার সঙ্গেই কিছু কথা ছিল, অধীর।'

'আমার সঙ্গে!' দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল অধীর। থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'অফিসে দেখা হলো কিছু বললেন না তো!'

এই উত্তরটা আশা করেনি সুকান্ত। সুতরাং, থমকে থাকল।

'আপনার নিশ্চয়ই তাড়া নেই।' বেরিয়ে যাবার আগে অধীর বলল, 'আমি ঘুরে আসছি—'

কিছু অপমান ও কিছু জ্বালা-মেশানো ভাব নিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল সুকান্ত। অধীর তাকে অপদস্থ করার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠল, নাকি সত্যিই তার কোথাও যাবার তাড়া ছিল, বুঝতে পারল না ঠিক। মনে পড়ল আজ অফিসে ইচ্ছে করেই অধীরকে এড়িয়ে যায় সে।

নীলিমা ঘরে এলো বেশ কিছুক্ষণ পরে। বিষণ্ন মুখ; ঈষৎ থমথমে। বসল না।

ওকে খুঁটিয়ে লক্ষ করতে করতে সুকান্ত বলল, 'অধীরের মতলব কী বুঝলাম না, আমাকে দেখেও চলে গেল! ও কি ঘরে ফিরেই আবার নিজের মূর্তি ধরেছে?'

নীলিমা জবাব দিল না। রাস্তার দিকে খোলা জানলা। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে একবার এগিয়ে গেল সেদিকে, কিছু দেখল যেন। তারপর

সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল মুখ নিচু করে।

সুকান্ত অস্বস্তি বোধ করছিল। নীলিমাকে কাছে এনে বসিয়ে সব কথা জিজ্ঞেস করবে কিনা ভাবল। তারপর বলল, 'কী ব্যাপার, নীলিমা! তোমাকে কেমন রেস্টলেস লাগছে!'

'কী ব্যাপার, তা কি এতদিনেও বুঝতে পারেননি!' আকস্মিক, প্রায় রূঢ় গলায় বলল নীলিমা, 'ও আজই ফিরেছে, আজই কি আপনার না এলে চলত না!'

'কী বলছ!' সুকান্ত কথা খুঁজল। ক'মুহূর্ত সময় নিয়ে বলল, 'আজ তুমি অফিসে যাওনি। ভাবলাম—'

'থাক।' নীলিমা বলল, 'অনেকদিন ধরে আমার অনেক উপকারই করেছেন। নিজের সংসার থাকতেও কেন যে আমাদের সংসার ভাঙার জন্যে—'

বলতে বলতেই গলার স্বর বুঁজে এলো নীলিমার। দু'এক মুহূর্ত ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে; তারপর কিছু না বলেই দরজার পর্দা সরিয়ে অদৃশ্য হলো ভিতরে।

শূন্য ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকল সুকান্ত। নিজেকে ধাতস্থ করার জন্যে যেটুকু সময় নেওয়া দরকার তা নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ফিরতে লাগল। দ্রুত, অন্যমনস্ক, সম্পর্কহীন; তৃতীয় ব্যক্তির মতো। ঠিক জানে না কোথায়!

ত্রাতা

পাড়ার কাছেই হাউসিং এস্টেটে সরকারি ফ্ল্যাট খালি হয়েছে। দরখাস্তে মন্ত্রীর সই-করা 'মে বি কনসিডার্ড' লেখা থাকলে সুবিধে হয়। খবরটা দিয়ে অফিসের রমেন ঘোষ বলল, 'পার্টি লেভেল ছাড়া আজকাল আর এসব হয় না, আনন্দদা। সেরকম কেউ থাকলে তাকে দিয়ে মন্ত্রীকে ধরান। আছে কেউ?'

অন্য সময় যেমন হয়, এখনো তেমনি, পরামর্শের শেষে প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে গেল আনন্দ ব্যানার্জি। পঞ্চাশ পেরুবার আগেই সংসার, স্ত্রী সীমা, স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার্থী সতেরো বছরের মেয়ে দোলন এবং পুরুলিয়ার স্কুলে ভর্তি হওয়া চোদ্দ বছরের ছেলে সুমনকে নিয়ে ল্যাজে-গোবরে হতে হতে সে বুঝে নিয়েছে খুঁটির জোর বড় জোর—টাকার খুঁটি আল্‌গা থাকলে যে-লোক যে-কোনো কেজো মানুষকে খুঁটি ধরতে পারে না, যে-কোনো প্রশ্নে সে অন্ধকারই দ্যাখে। এখনও দেখল।

আনন্দকে চুপ করে থাকতে দেখে রমেন বলল, 'সেবার আপনার বাড়িওলা ঝামেলা করার সময় কে একজন হেল্‌প করেছিল বলে-ছিলেন। তাকে ধরুন না! সেও তো পার্টি করে বলেছিলেন?'

'টোটা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। টোটা।'

'লোকাল কমিটির লোক। মাস্তানি করে বেড়ায়। পুলিশকেও হাত করে রেখেছে।' পর পর এই কথাগুলো বলে একটু থামল আনন্দ। দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু, ও মন্ত্রীর কী বুঝবে!'

'বুঝুক না-বুঝুক, একটা উপায় তো বাতলে দিতে পারে। মাস্তানেরও মাস্তান থাকে, দেখুনই না কথা বলে!'

এসব কথা হয় অফিস-ফেরত, মিনিবাসে বসে, নিচু গলায়। কথাগুলো মাথায় নিয়ে টোটা ওরফে গণেশ হালদার সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতাগুলোকে একত্র করতে গিয়ে আরো চুপচাপ হয়ে গেল আনন্দ।

মাস ছয়েক আগে বাড়িওলা সাধন মিত্তির তাদের উঠিয়ে দেবার জন্যে ঝামেলা, শাসানি, জলবন্ধ শুরু করলে অনেক ভেবেচিন্তে কথাটা টোটার কানে তুলেছিল আনন্দ। পাত্তা পায়নি খুব। একটু বা তাচ্ছিল্যের গলায় টোটা বলেছিল, 'অত ভয় পান কেন বলুন তো! শালা বাঙালি জাতটাই দেখছি ক্রমশ ভিতু হয়ে যাচ্ছে! কী, দাদা, অ্যাঁ! আ-রে, বাড়িওলা ভাড়াটের এই কিঁচাই চলছে সেই শেক্স-পীয়ারের জমানা থেকে। দিন, পঞ্চাশ টাকা দিয়ে যান পার্টি ফান্ডে। তারপর বাড়ি গিয়ে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোন।'

টোটা এমনভাবে তাকিয়েছিল যে আনন্দর মনে হয়েছিল টাকাটা তখুনি বের করে না দিলে উল্টো ফল হবে—আজ রাতেই সপরিবারে বাড়িছাড়া হতে হবে তাকে। গায়ে লাগলেও, সুতরাং, দ্বিধা করেনি সে। পরের দিন সন্ধেয় অফিস থেকে ফিরে সীমার কাছে শুনল, দুপুরে কারা যেন দমাদ্দম লাথি মেরেছে বাড়িওলার দরজায়, গালি-গালাজ করেছে বিচ্ছিরি ভাষায়। সাধনবাবু তারপর দোতলায় এসে ক্ষমা চেয়ে গেছে সীমার কাছে।

'শুনতে পাচ্ছ, বাথরুমে জলের শব্দ! তিনদিন পরে আজ মনের সুখে চান করেছি।'

'হ্যাঁ। চান না করলে চলবে কেন!'

অন্যমনস্ক গলায় স্ত্রীর কথার জবাব দিতে দিতে আনন্দ ভেবেছিল সাধন মিত্তির তার চেয়ে ধনী। বছর তিনেক আগে পুলিশ ডেকে উচ্ছেদ করেছে একতলার ভাড়াটেদের—সেখানে এখন তার ক্রিম-সাবান—পাউডারের হোলসেল ব্যবসার গোডাউন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে, কিংবা গভীর রাতে, এসবের গন্ধ নাকে এলে আনন্দ দেখতে পায় গ্যারাজের গায়ে ট্রাঙ্ক-স্যুটকেস-বাসনকোসন ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে পুলিশ, স্তম্ভিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে দত্ত পরিবারের পাঁচজন। স্তম্ভিত মানুষের প্রতিক্রিয়ার দায় থাকে না; ওদেরও ছিল না। এমন কি হতে পারে যে একদিন দুপুরে তাদের দরজাতেও দমাদ্দম লাথি পড়বে? পঞ্চাশ টাকায় এই হলে পাঁচশো বা পাঁচ হাজারে আরও কী কী হতে পারে—এসব ভেবে সিঁটিয়ে গিয়েছিল সে।

আনন্দর আত্মমর্যাদাবোধ প্রখর। বাড়িওলার ঝামেলার কথাটা

রমেনকে বললেও টোটা সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য সে চেপে গিয়েছিল খেলো হয়ে যাবার ভয়ে। টোটাদের পার্টি ফান্ডে পাঁচ টাকার বেশি চাঁদা দিতে রাজি না-হওয়ায় ছেলেগুলো যেদিন চাঁদা না নিয়েই চলে গেল দরজা থেকে, তার কয়েকদিনের মধ্যে সন্ধের পর পাড়ার ক্লাবের সামনে প্রায় ফাঁকা রাস্তায় পেয়ে আচমকা তার পাঞ্জাবির কাঁধ চেপে ধরেছিল টোটা। জীবনে প্রথম ভয়ঙ্করের সম্মুখীন হয়ে আনন্দর মনে হচ্ছিল হাড়-মাংস আলাদা হয়ে যাচ্ছে, শীত ঢুকছে শরীরে, সম্ভবত মৃত্যুও এসে যাবে। এরপর রদ্দা মারতে গিয়েও মারেনি টোটা। ওর নির্দেশে একটা ছেলে শুধু ধুতির কাছাটা টেনে খুলে দিল। টোটা জিজ্ঞেস করল, 'ওর নীচের জায়গাটার নাম কি জানেন?' অপমানে জবাব দেয়নি আনন্দ। তখন ভারী মুখের তুলনায় ছোট চোখদুটিকে ঠাণ্ডা ও উদাসীন করে টোটা বলল, 'কাল আবার ওরা যাবে। দশ টাকাও নয়—সাহস দেখানোর জন্যে আরও দশ টাকা চাঁদা দেবেন। না হলে ওখানে লোহার রড ভরে দেবো। আমার নামটা জেনে রাখুন। গণেশ হালদার। সবাই বলে টোটা। লোকাল কমিটির অফিসে কিংবা ক্লাবে খোঁজ করলে পাবেন।'

ছেড়ে দেবার পর হাড়, মাংস এক হলেও অপমানবোধ থেকে অন্য যে-বোধটা হুহু করে ঢুকে পড়ে আনন্দর শরীরে, তার নাম ভয়। নিজের প্রতি ঘৃণাও। টোটা উচ্চারণ না করলেও 'পোঁদ' শব্দটা নিজেই গেঁথে নেয় মাথায়। ভুলতে পারে না। বাথরুমে পেচ্ছাপ করতে ঢুকে অদ্ভুত শারীরিক অস্বস্তিতে পঞ্চাশ বছরের ছা-পোষা শরীরটাকে দুমড়ে হড় হড় করে বমি করে ফেলে সে। এতদিন ক্লান্ত হতে হতে প্রায়ই হার্ট বা সেরিব্রাল অ্যাটাক বা গ্যাসট্রিক আলসার হবার সম্ভাব্যতা নিয়ে ভেবেছে, কোনোদিন মনে হয়নি ওই বিশেষ অঙ্গটি নিয়েও চিন্তা করতে হবে।

ঘটনাটা সীমাকে বলেছিল, তবে বিশেষ শব্দটা বা রড ভরে দেবার সম্ভাবনার কথা আড়াল করে। সীমার পরামর্শে পরের দিন ওরা আসবার আগেই সে চলে যায় লোকাল কমিটির অফিসে। টোটাকে দেখে ভয় ও ঘৃণা চাপতে চাপতে যতটা সম্ভব আহ্লাদিত গলায় বলে, 'পঞ্চাশই দিলাম। মানে…'

'খুশি হয়ে দিচ্ছেন, না ভয়ে ?'

'না, না। খুশি হয়েই।'

'তাহলে ঠিক আছে।' রসিদ কেটে টোটা বলল, 'আমাদের কাছে বেইমানি পাবেন না। নিন। আসবেন মাঝে মাঝে।'

স্ত্রীর কাছে যা আড়াল করে রাখতে হয়, বাইরের লোককেও তা বলা যায় না। বাড়িওলার ঘটনারও আগের এই ঘটনাটা চেপে গিয়েছিল আনন্দ। চেপে গিয়েছিল আরো কিছু কথা। রমেন জানে না, এখন প্রতি মাসে সে নিয়মিত লোকাল কমিটি অফিসে গিয়ে দশ টাকা চাঁদা দিয়ে আসে। বাড়িওলার শাসানি বন্ধ হবার পর এই ধরনের লোককে বাড়িতে ডেকে আনার ব্যাপারে সীমার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও একদিন টোটাকে ডেকে সে চা আর ডাবল ডিমের ওমলেট খাইয়েছিল। দোলন অঙ্কে কাঁচা—টিউটোরিয়ালে দিয়েও উন্নতি হয়নি বিশেষ, ওকে বাড়িতে কোচিং দিয়ে পড়াবার জন্যে সুদেবকে প্রাইভেট টিউটর নিয়োগ করার আগে মাখো-মাখো হবার চেষ্টায় গোপনে পরামর্শ নিয়েছিল টোটার। পরে সীমাকে বলেছিল, 'টোটাকে দিয়ে খোঁজ নেওয়ালাম। ছেলেটি ভালো। স্কুল-মাস্টারি করে সংসার চালায়। নিডি।'

'তুমি কি দোলনের বিয়ের পাত্র খুঁজছ ?'

'কেন !'

'কাকে টিউটর রাখব না রাখব সেটা আমাদের নিজেদের ব্যাপার। এতেও ওই চোয়াড়ে ছোকরার সার্টিফিকেট নিতে হবে নাকি ! আশ্চর্য তো !'

সীমার দৃষ্টিতে সন্দেহ ক্রমশ ঘৃণায় পরিণত হচ্ছে দেখে গুটিয়ে গেল আনন্দ।

'সেজন্যে নয়।'

'তবে !'

'বাড়িতে একটা উটকো ছোকরা আসছে। যদি এ নিয়েও কোনো-ঝামেলা করে ! ধরো বাড়িওলাই টাকা খাইয়ে কব্জা করে নেয়—লাগায়—'

সীমা হঠাৎ বলল, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো ?'

'কী হয়েছে!'

'নিজে বুঝতে পারছ না!'

প্রশ্ন, না বিস্ময়, ধরতে না পেরে স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে বিভ্রান্ত বোধ করেছিল আনন্দ। কিছুক্ষণ থেমে থেমে ভেবেছিল, ভয় না দেখিয়ে টোটার দল যদি সেদিন শেষই করে ফেলত তাকে, তাহলে এতদিনে এই প্রশ্ন করার সুযোগ পেত না সীমা। তার মানে কি এরকমও হয় যে, জীবনদানের পরে সে টোটাকেই তার ত্রাতা ধরে নিয়েছে? তার এবং তার পরিবারের? নাকি জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে বাঁচা সম্পর্কে সন্দেহ ঢুকিয়ে লোকটা মজা করে গেল শুধু! এভাবে ভাবতে ভাবতে সে বলেছিল, 'বুঝলে তো বুঝতেই পারতাম!'

সীমা বলল, 'এর পর তো দেখছি পাড়া ছাড়তে হবে!'

'যাতে না হয়, সেইজন্যেই—।' এর পরের কথাটা স্বগতোক্তির মতো ফুটে উঠেছিল আনন্দর গলায়, 'যাবে কোথায়!'

ফ্ল্যাটের জন্যে মন্ত্রীর সুপারিশের ব্যাপারে সেই টোটাকেই ধরার কথা ওঠায় সেদিন রমেন মিনিবাস থেকে নেমে যাবার আগে আনন্দ ভাবল, সব অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে বলতে নেই। সীমাকেও কি সব বলেছে! তারপর বলল, 'বলছ যখন, তখন বলে দেখতে পারি ওকে। কিন্তু বলতে গিয়ে উল্টো হবে না তো?'

'উল্টো মানে?'

'ধরো টোটো ব্যাপারটা জানল, তারপর আমার জন্যে না করে আর কারও জন্যে সুপারিশ এনে দিল। তখন কী হবে!'

'কী আর হবে! যেমন আছেন তেমনি থাকবেন। আপনি এমন-ভাবে বলছেন, অ্যাজ ইফ—।' কথাটা শেষ করল না রমেন। স্টপ এসে গিয়েছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলি—'

তার পর থেকে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করতে করতে একার মনে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল আনন্দ। সে রাজনীতি বোঝে না, বাঁচা বোঝে। পঞ্চাশ বছর বয়সে পেঁছুবার আগে কী করলে আরো ভালোভাবে বাঁচা যায় তা গুলিয়ে ফেলে ক্রমশ বুঝতে পারে, যেমন আছে তেমনিই থাকার মানে থেমে থাকা এবং মৃত্যুকে এগিয়ে আসতে দেওয়া।

এভাবেও কি বাঁচে মানুষ!

সীমা তার চেয়ে দশ বছরের ছোট। অন্তর্নিহিত কী এক শক্তিতে তার স্ত্রী হয়েও এখনো টসকায়নি এতটুকু। আগে আগে, অন্ধকারে সীমার শরীরে নিজেকে সেঁধিয়ে দিতে দিতে মনে হতো বয়সের ব্যবধানটা ভাগাভাগি করে নিয়েছে দুজনে। এর ফলে দোলন আসে, পরে সুমন। ফ্ল্যাট সম্পর্কিত চিন্তার মধ্যে সেদিন রাতে সীমার শরীর থেকে নিজেকে আলাদা করে নিতে নিতে আনন্দর মনে হয়, টোটার দেওয়া শাস্তির মতো দশের সঙ্গে আরো দশ জুড়ে দিয়েছে সীমা। বাড়তিটা ব্যর্থতার জন্যে। অন্ধকার সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে ফ্ল্যাটের দরখাস্তে মন্ত্রীর সুপারিশ জোগাড় করে দেবার জন্যে টোটাকে ধরার পরিকল্পনাটা সীমাকে বলবে ভেবেও বলে না। টের পায় ভয় আসছে; সীমা হয়তো আবার জিজ্ঞেস করবে, তোমার কী হয়েছে বলো তো! উত্তর থাকবে না। সুতরাং, সে চেপেই গেল।

রমেনের পরামর্শ মতো পরের দিন দরখাস্ত নিয়ে টোটার সঙ্গে দেখা করল আনন্দ। আড়ালে ডেকে যতদূর সম্ভব বিনীত হয়ে বলল, 'তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে, গণেশভাই! মন্ত্রী যদি একটা রেকমেন্ড করে দেন—'

'মন্ত্রী রেকমেন্ড করলেই হয়ে যাবে!'

'না, মানে কিছুটা এগোনো তো যাবে!'

দরখাস্তটা হাতে নিয়ে ঠান্ডা চোখে তার দিকে তাকাল টোটা।

'পাড়া ছাড়তে চাইছেন কেন? বৌদির ইচ্ছে?'

'না—মানে—, একটু বড় জায়গা, ভাড়াও তো কম! কতটা আর দূরে! এক কিলোমিটারও নয়—'

'ঠিক আছে। থাক। পরশু আসুন।'

এইভাবে শুরু। হচ্ছে, হবে করে প্রায় এক মাস ঘোরালো টোটা। কোনোদিন বলে, 'কাল আসুন,' কোনোদিন 'পরশু'। এসব বলেই গম্ভীর হয়ে যায়। চোখদুটোকে নৈর্ব্যক্তিক করে এমনভাবে তাকায় যে হিম হয়ে যায় রক্ত; আশঙ্কায় টিপটিপ করে কাছার নীচের জায়গাটা। মনে হয়, পরের কথাটা উচ্চারণ করলেই হয় চাকু না হয়

রিভলভার বের করে তাক করবে বুকে। কোন কারণে বিগড়ে গেল না তো! সেদিন হঠাৎ সীমারই ইচ্ছে কি না জিজ্ঞেস করল কেন! সে কি সীমাকে নিয়েই আসবে একদিন, ওর অনুরোধে যদি গলে! এইভাবে চিন্তা বা দুশ্চিন্তাগুলোকে সাজাতে সাজাতে স্বাভাবিকের চেয়ে আরো একটু বিষণ্ণ হয়ে আনন্দ ভাবল, বিগড়ে যাবে কেন! ভিখিরির মতো মাঝে মধ্যে সামনে গিয়ে দাঁড়ানো, নিজের স্বার্থের ব্যাপার নিয়ে খোঁজখবর করা এবং যা বলছে শুনে ফিরে আসা ছাড়া ইতিমধ্যে সে এমন কিছুই করেনি যাতে গণেশ হালদার, ওরফে টোটা, বিরক্ত হতে পারে। ভাবতে ভাবতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মন্থর ও অন্যমনস্ক হয়ে বাড়ি ফেরে সে।

এইভাবে যখন সে হবে না-ই ধরে নিয়েছে, তখন একদিন সত্যি-সত্যিই মন্ত্রীর সই-করা চিঠিটা আনন্দর হাতে তুলে দিয়ে, ব্যস্ততাজনিত কারণে যা বলবার তার চেয়ে বেশি কোনো কথা না বলে, নতুন ফটফটিয়া উড়িয়ে তার সামনে থেকে চলে গেল টোটা। আনন্দের মনে হলো স্বর্গ পেয়ে গেছে হাতে।

॥ ২ ॥

মন ভালো থাকলে হাঁটার ধরনেও পরিবর্তন আসে আনন্দর। পঞ্চাশ বছর বয়সটাকে অনায়াসে কমিয়ে আনতে পারে পঁয়ত্রিশে। প্রায় কিছুই না হওয়া সাদামাটা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া কুঁজো ভাবটা কেটে যায়, পিঠ সটান হবার সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে ফিনফিনে একটু হাসি। এসব সময় নিজের মুখ নিজে না দেখতে পেলেও অনুভূতি চিনে স্বচ্ছন্দে একটা সিগারেট ধরাতে পারে সে। বুঝতে পারে হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে আবার।'

সেদিন সন্ধের আগে পার্টির লোকাল কমিটির অফিসে টোটার সঙ্গে দেখা করে ফেরবার সময় নিজেকে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর লাগল তার। পার্টি ফান্ডে স্পেশাল চাঁদা বাবদ শ খানেক টাকা গচ্চা গেছে যাক— আরো যাবে হয়তো, পাঞ্জাবির বুক-পকেটে ফাঁকা হয়ে যাওয়া জায়গাটা ভরে গেছে মন্ত্রীর সই-করা চার ভাঁজে বন্দি দরখাস্তে। সীমাকে

দেখাবে। কাল অফিসে গিয়ে দেখাবে রমেনকে, তারপর জেরক্স করে জমা দেবে। বিশ্বাস-ফেরানো এরকম একটা কিছু সঙ্গে থাকলে মনে হয়—না, কিছু-কিছু ঘটনা এখনো ঘটে। অত হতাশ হবার কী আছে! আশপাশের অধিকাংশ লোক আত্মকেন্দ্রিক আর স্বার্থপর হলেও সবাই কি আর সেরকম! তা যদি হতো, তাহলে টোটার মতো একজন ত্রাতা পেত কোথায়!

লোকাল কমিটির অফিস থেকে আনন্দের বাড়ি পায়ে হেঁটে মিনিট সাতেক। তার আগে বড় রাস্তা থেকে তাকে বাঁক নিতে হয় ছোট রাস্তার নির্জনতায়। সেখান থেকে সোজাসুজি চোখে পড়ে একটা মোটর গ্যারাজ। তার পিছনে গলি, বাড়ি। লোডশেডিং না থাকলেও অজ্ঞাত কারণে তার বাড়ি ফেরার রাস্তাটা সন্ধের পর কখনোই পুরো-পুরি আলোকিত থাকে না। আজও ছিল না। তবে বাড়ির আলো ঠিকই চিনতে পারে সে। কারও বিয়ে না কী উপলক্ষে যেন বাড়িওলা সপরিবারে কলকাতার বাইরে গেছে ক'দিনের জন্যে। তেতলা অন্ধকার থাকলেও বড় রাস্তার শেষে এসে দোতলায় নিজেদের আলোটা চিহ্নিত করতে ভুল হলো না তার।

ছোট রাস্তায় বাঁক নিয়ে কিছুটা এগিয়ে আজ একটা অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখল আনন্দ। গ্যারাজ আর গলির মাঝখানের প্রায়ান্ধকার জায়গাটায় বড় রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সীমার মতো কেউ। অদ্ভুত স্থির আর কেঠো ভঙ্গি। এর আগে কখনো এমন দৃশ্য না দেখায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোটানা নিয়ে আরো কয়েক পা এগিয়ে আনন্দ নিশ্চিত হলো সে ভুল দেখেনি। সীমাই। তাহলে কি চাবি হারিয়ে ফেলল!

বাড়িতে ঢোকার জন্যে সদরের ল্যাচের তিনটি চাবি আছে তাদের—তার, সীমার আর দোলনের; কোনো কারণে তিনজনের যে-কোনো দু'জন বাড়িতে না থাকলে যাতে তৃতীয়জনের ঢুকতে অসুবিধে না হয়। সীমা বলেছিল আজ দুপুরে পার্ক সার্কাসে যাবে, তার বাপের বাড়ি; সম্ভবত গিয়েও ছিল। তাহলেও দোলন স্কুল থেকে ফিরে বাড়িতে থাকবে। সুদেব ওকে পড়াতে আসবে সাতটা সাড়ে-সাতটা নাগাদ। এখনো সাতটা বাজেনি। এ সময় চাবি হারালে দোলনই তো দরজা

খুলে দিতে পারে! তাহলে কি দোলনই ফেরেনি এখনো!

আনন্দ আবার কুঁজো হয়ে গেল।

'কী ব্যাপার! এখানে?'

'দাঁড়াও তুমি।' মুখের ছায়াছন্নতা গলায় টেনে এনে সীমা বলল, 'কথা আছে।'

'দোলন ফিরেছে?'

'ফিরেছে।'

এখন গ্যারাজের কাজকর্ম বন্ধ। ভিতরে একটা আলো জ্বললেও সেই আলোর রশ্মি স্পর্শ করছে না তাদের। আনন্দর ডান হাতের কব্জিটা হঠাৎ মুঠোয় চেপে ধরে ওকে নিজের যতটা সম্ভব পাশে টেনে এনে অদ্ভুত স্বরে সীমা বলল, 'মেয়ে সর্বনাশ করেছে—'

আশপাশের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে টোটার ফটফটিয়ার শব্দের মতো সীমার কথাগুলো ফাটতে লাগল মাথার মধ্যে। স্ত্রীর মুখের কঠিন রহস্যময়তার দিয়ে তাকিয়ে সেই মুহূর্তে উদ্ভূত প্রশ্নটা দলা পাকিয়ে গেল আনন্দ ব্যানার্জির গলায়।

সীমা নিজেকে সামলে নিয়েছিল। খুব চাপা গলায় বলে গেল এর পরের কথাগুলো।

তিনটে নাগাদ সে বাপের বাড়ি যাবে বলে তৈরি হচ্ছিল, এমন সময়ের আগেই ফিরে আসে দোলন। স্কুলের কোন পুরনো টিচার মারা গেছে না কি, ছুটি হয়ে গেছে আগে। সীমা ওকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিল; মাথা ধরেছে, ঘুমোবে বলে গেল না দোলন। পাঁচটার মধ্যেই ফিরবে জানিয়ে সীমা এরপর বেরিয়ে যায়। বাসেও ওঠে। বাস যখন স্টপ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, হঠাৎ সুদেবকে লক্ষ করে রাস্তায়। প্রথমে কিছু ভাবেনি সে। আরো কিছু দূর গিয়ে মনে হয়, এই অসময়ে সুদেব হঠাৎ তাদের রাস্তায় কেন, তার তো স্কুলে থাকার কথা! সে বাপের বাড়ি যাচ্ছে, দোলন স্কুল থেকে ফিরে এলো, সুদেবও স্কুলে না থেকে হাঁটছে তাদেরই রাস্তার দিকে—একই সঙ্গে এই ব্যাপারগুলো ঘটছে কী করে! তাহলে কি আরো কিছু আছে ঘটনাগুলোর মধ্যে? সন্দেহ ও আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে মাঝ রাস্তায় নেমে পড়ে সীমা; উল্টোদিকের বাস ধরে ফিরে আসে মিনিট কুড়ি-

পঁচিশের মধ্যে। দোলন বাড়িতে আছে জেনেও সন্দেহবশত বেল দেয়নি দরজায়। নিঃশব্দে চাবি ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকে দোলনের ঘরের পর্দা সরিয়েই হিম হয়ে যায় সে।

ধরে রাখা নিঃশ্বাসটা ছাড়ার চেষ্টায় আরো এলোমেলো করে ফেলল আনন্দ।

'কী দেখেছ?'

'সেটাও বলে দিতে হবে!'

'বলো!' স্ত্রীর বাঁ হাতটা মুচড়ে ধরে চাপা কিন্তু হিংস্র গলায় আনন্দ বলল, 'বলতে হবে।'

'ওরা বিছানায় ছিল। হুঁশ ছিল না।' যন্ত্রণায় ঠোঁট কুঁকড়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সীমা।

একজন গ্যারাজের লোক বেরিয়ে এসে খানিক তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার ঢুকে গেল ভিতরে। বড় রাস্তা ঘুরে একটা রিকশা আসছে এদিকে। সেদিকে চোখ রেখে অস্বস্তি কিংবা অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল সীমা। আগের কথার জের টেনে বলল, 'দেখে মনে হলো ব্যাপারটা পুরনো। এসব একদিনেই হয় না।'

'কিছু বলেছে?'

'কে?'

'সুদেব?'

'না।' সীমা বলল, 'লজ্জায় কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। কী জিজ্ঞেস করব!'

'এই সাহস ও পেল কোত্থেকে?'

সীমা জবাব দিল না। পরে বলল, 'আমি ওকে আসতে বারণ করেছি। মেয়েকে মেরেছি। কোনো লজ্জা নেই! বলল, সুদেব ওকে ভালোবাসে। ওরা বিয়ে করবে।'

'তার আগে আমি ওকে খুন করব।'

সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে আনন্দর খানিক আগেকার চেহারা। যেসব চিন্তা থেকে আশায় ঘন করে তুলেছিল নিজেকে, হারিয়ে গেছে সব। কথাগুলো বলেই ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে সে হেঁটে গেল বাড়ির দিকে।

সীমা আঁচ করল কিছু ঘটতে যাচ্ছে, কিছু ঘটতে পারে। সুতরাং

সেও তৎপর হলো। দোতলায় যাবার সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে পিছন থেকে টেনে ধরল আনন্দকে।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে !'

'হইনি। হবো। তার আগে খুন করব ওকে।'

স্বামী-স্ত্রী এখন প্রায় মুখোমুখি। সীমা হাত আল্‌গা করেনি। ক' মুহূর্ত আনন্দর ক্রুদ্ধ, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থেকে প্রায় ধমকে বলল, 'এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করবে না। একটা কথাও বলবে না দোলনকে।'

'কেন !'

'এখনো অনেক কিছু জানতে হবে আমাকে। মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সীমার গালে সপাটে একটা চড় কষালো' আনন্দ। এবং একই অভিব্যক্তিতে বলে উঠল, 'তাহলে আমাকে বললে কেন ?'

ঘটনার আকস্মিকতায় মুখের রং পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে জ্বালায় ভরে উঠেছে সীমার চোখ দুটো। আনন্দকেই দেখছে। দেখতে দেখতে, বেশ কিছুক্ষণ পরে, অন্যরকম গলায় বলল, 'আর কাকে বলব !'

আনন্দ জবাব দিল না। তারপর যেন কিছুই হয়নি এইভাবে সীমার পিছনে পিছনে উঠে এলো দোতলায়। বিছানায় মাথা ঝুঁকিয়ে বসে সমূহ বোধশূন্যতার মধ্যে শুধু টের পেল—অনুভূতিটা ফিরে আসছে, টিপটিপ করছে কাছার নীচের জায়গাটা। বমিও পাচ্ছে। এসব সামলাতে তার শব্দহীন চোখ দুটো ভরে উঠল জলে।

পরের দিন অফিসে রমেন ঘোষ জিজ্ঞেস করল, 'কী, আনন্দদা, খবর আছে কিছু ?'

'কিসের ?'

'একটাই তো ব্যাপার। ফ্ল্যাট। টোটা জানালো কিছু ?'

'নাঃ।'

মিথ্যে কথাটা সহজেই বলতে পেরে কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করল আনন্দ। অন্যমনস্কতার মধ্যে ডান হাতটা উঠে এলো বুক-পকেটের

গায়ে। কাল সন্ধেয় কাগজগুলো বের করে যেভাবে আলমারির মাথায় রেখেছিল, আজও সেইভাবেই তুলে নিয়েছে পকেটে। মন্ত্রীর সই-করা দরখাস্তটাও আছে ওর মধ্যে। তখন ভাবল, ফ্ল্যাটের দরখাস্তের সঙ্গে দোলনের ঘটনার সম্পর্ক কী? তাহলে সে মিথ্যে বলতে গেল কেন!

রমেন বলল, 'আপনাকে কেমন অন্যমনস্ক লাগছে?'

'কেন!'

'লাগছে বলেই বললাম।'

চোখ তুলে রমেনের দিকে তাকানোর সাহস হলো না আনন্দর। ঠিক কোন সময়ে মনে পড়ল না, তবে কাল গভীর রাতে কোনো এক সময়ে সীমা বলেছিল, 'ভুল তো মানুষই করে'। এখন সেই কথাটাকেই আঁকড়ে ধরল সে এবং বলল, 'মানুষ অন্যমনস্ক থাকে না!'

রমেন সরে গেল।

আনন্দ এগোতে পারল না। জায়গাটা চেনা। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা সন্দেহটাও চেনা। শুধু বুঝতে পারছে না কোনদিকে এগোবে।

টিফিনে রমেনকে একা পেয়ে গভীর থেকে উঠে এলো আনন্দ। চেয়ার টেনে বসল সামনে।

'কেন অন্যমনস্ক জিজ্ঞেস করছিলে। আসলে কাল একটা ব্যাপার ঘটেছে—'

'কী?'

পরের কথাটা বলবার আগে সীমা এসে দাঁড়াল সামনে। নিজেকে সংযত করে নিয়ে আনন্দ বলল, 'পাশের বাড়িতে—'

প্রশ্ন না করে রমেন তার চোখে চোখ রাখছে দেখে দ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে জানলার বাইরে তাকাল আনন্দ। পরিচিত দৃশ্য নতুন কিছুই দেখালো না। তখন নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দৃষ্টিটা আবার ফিরিয়ে আনল রমেনের মুখে।

'মর্যাদা গেলে মানুষের কী থাকে?'

'মর্যাদা ছাড়া আর সবকিছুই।' সন্দেহগ্রস্ত হলেও জবাবে দ্বিধা রাখল না রমেন, 'সবই—জীবন, বেঁচে থাকা, সুখ—'

'মর্যাদার দাম নেই !'

'আছে।' রমেন ঝুঁকে এলো, 'আপনি বোধহয় আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। কী হয়েছে, বলুন না!'

আনন্দ আবার পিছিয়ে গেল। দূরত্বে থেকে, সময় নিয়ে বলল, 'পাশের বাড়িতে আমার এক বন্ধু থাকে। তার মেয়ে। কাল বাড়ি ফিরে শুনলাম প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গে—মানে, ওই আর কি, বুঝতে পারছ—তখন কেউ ছিল না বাড়িতে। দোষটা ওই ছোকরারই—বুঝতে পারছ— ?'

'পারছি।'

'ধরা পড়ে যায়। বন্ধু খুব আপসেট। কী করবে বুঝতে পারছে না।'

রমেন চুপ করে থাকল।

আনন্দ বলল, 'আমাকে জিজ্ঞেস করছিল। তুমি বলতে পারো ?'

'মেয়েটির বয়স কত ?'

ধরা পড়ার ভয়ে আনন্দ বলে ফেলল, 'কুড়ি।' তারপর দ্রুত নেমে এসে বলল, 'না, অত হবে না। ধরো—ম্যাক্সিমাম সতেরো—'

'লোকটাকে পুলিশে হ্যান্ডওভার করা উচিত।'

'না, না। সেটা ঠিক হবে না।'

'কেন ?'

'তাহলে লোক জানাজানি হবে। কোর্টে কেস উঠবে। মেয়েটার ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হয়ে যাবে।'

'সেটা নাও হতে পারে।' নড়ে বসে রমেন ঘোষ বলল, 'যদি সিরিয়াসলি জানতে চান, বলতে পারি। কলকাতা পুলিশের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারকে আমি চিনি। ছোকরাকে ধরিয়ে এনে আচ্ছা করে ধোলাই দিলে ভবিষ্যতে টিউটর সেজে আর কারও মেয়ের সর্বনাশ করার কথা ভাববে না।'

'ও।' আনন্দ ঘাবড়ে গেল হঠাৎ। সেইভাবেই বলল, 'আর কারও মেয়ের কী হবে না হবে তা নিয়ে আমি ভাবব কেন!'

'আপনি ভাববেন মানে!'

'ওই আর কি। বন্ধুর মেয়ে আর আমার মেয়েতে তফাত কি!'

অসাবধানে বলে ফেলা কথাগুলোকে গিলতে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল আনন্দ। তাড়াহুড়ো করে বলল, 'এসব নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা কোরো না যেন!'

রমেন জবাব দিল না।' তাকেই লক্ষ করছে দেখে হাতের তালু-দুটো জড়ো করে নিজের মুখের ওপর চেপে ধরল আনন্দ। সীমার বর্ণনায় ভুল না থাকলে গতকাল এই সময় দোলন এবং সুদেব জানত তারা কী করতে যাচ্ছে। সীমা জানত না। গতকাল এই সময় সে এই তিনজনের কারও কথাই ভাবেনি। ভাবছিল কীভাবে টোটার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। সই-করা দরখাস্তটা হাতে পেয়েও ভাবতে পারেনি কুড়ুল পড়েছে মাথায়। এসব ভেবে তালুর আড়ালে চোখ দুটো ভিজে এলো তার।

পাছে আবার বেফাঁস কিছু বলে ফেলে, এই ভয়ে আবেগটাকে সংযত করে নিল আনন্দ। আরো একটু সময় নিল। মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে বলল, 'লক্ষ করেছ, আমাদের জীবনটা ক্রমশ কেমন খোস-পাঁচড়ায় ভরে যাচ্ছে! মরবিড হয়ে যাচ্ছে! কেন এমন হচ্ছে, বলতে পারো?'

রমেন অন্যমনস্ক। বলল না কিছু।

উঠতে উঠতে আনন্দ বলল, 'তোমার চেনা পুলিশের কথাটা বলব বন্ধুকে। যদি দরকার হয়।'

সেদিন অন্যদিনের চেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলো আনন্দ।

সীমা বলল, 'সুদেব এসেছিল—'

'কে?'

'সুদেব। দোলনের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল। আমি দিইনি। বলেছি বাড়াবাড়ি করলে পুলিশে খবর দেবো। দোলন জানে না। ও বাথরুমে ছিল।'

'চলে গেল?'

'শাসিয়ে গেল। বলল, আমরা ওকে আটকাতে পারব না।'

আনন্দ ঘরে ঢুকল। পাঞ্জাবি খুলে আলনায় ঝুলিয়ে রেখে তাকাল স্ত্রীর দিকে। কিছু বলতে গিয়েও না বলে এমন ভঙ্গিতে ধরে রাখল নিজেকে যেন সীমার কোনো কথাই তার মাথায় ঢোকেনি।

সীমা বলল, 'ভীষণ ভয় করছে। এভাবে কতদিন আগলে রাখব মেয়েকে!'

আনন্দ এবারও সাড়া দিল না। সময় দেখে, রিস্টওয়াচটা খুলে আলমারির মাথায় রেখে বাথরুমে যাবার আগে শুধু বলল, 'চা করো। আমি একটু বেরুবো—'

॥ ৩ ॥

নতুন আর ঝকঝকে ফটফটিয়া পেয়ে আদবকায়দা বদলে গেছে টোটার। লোকাল কমিটির অফিসের অদূরে 'যুবকদল' বোর্ড টাঙানো ক্লাবের সামনে আলাদা দাঁড়িয়ে আনন্দর কথাগুলো শুনে বলল, 'দাঁড়ান আসছি।'

তারপরেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল বাইকে। মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

ভট্-ভট্-ভট্-ভট্; বিলীয়মান একটানা গর্জনটা মাথার ভিতর থিতিয়ে যেতে ঘামতে শুরু করল আনন্দ। এবং ভাবল, কাজটা কি ঠিক করলাম? প্রশ্নে দাঁড়াতে পারল না। তারপর ভাবল, ভুলই বা করলাম কোথায়? সীমা নিজেই বলেছে, শাসিয়ে গেছে সুদেব। পুলিশে জানাবার হলে তো গতকালই জানাতে পারত। সুদেব কি জানে মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে এখন ঘটনাটা চেপে যাবে তারা! দোলনকেই বা বুঝবে কী করে! আজ বাথরুমে ছিল বলে কালও সে বাথরুমে থাকবে এমন হতে পারে না। যদি সেরকম কিছু ঘটে, সীমা একা সামলাতে পারবে না। তাহলে কাল থেকে অফিসে যাওয়া বন্ধ করে তাকেও বসে থাকতে হবে বাড়িতে। কতদিন?

সীমাকে বলেনি সে টোটার কাছে যাচ্ছে। বললে বাধা দিত হয়তো। এখন মনে হলো স্ত্রীকে অবিশ্বাস করে সে টোটাকে বিশ্বাস করল কেন? যেরকম গা-ছাড়া ভাব দেখালো টোটা, 'আসছি' বলে চলে গেল, তাতে ঘটনাটাকে গুরুত্ব দেবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু, স্ক্যান্ডাল ছড়াতে পারে। এর চেয়ে পুলিশে জানালেই কি ভালো হতো, রমেন যেমন বলেছিল?

একের পর এক প্রশ্নে নিজেকে জড়াতে জড়াতে খেই হারিয়ে

ফেলল আনন্দ। চেষ্টা করল শুরুতে ফিরে যেতে। কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল! এরই মধ্যে মৃত্যুপুরীর চেহারা নিয়েছে বাড়িটা। নষ্ট হয়ে গেছে তিনটি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বাভাবিকতা। কাল সীমা বারণ করার পর দোলনকে কিছু বলেনি সে। দোলনও এড়িয়ে যাচ্ছে তাকে। তবে মনে হয়, তার অগোচরে কিছু একটা চলছে সীমা আর দোলনের মধ্যে। কাল নিজের ঘর থেকে বেরোয়নি দোলন; আজ অফিস থেকে ফিরে দেখল খাবার টেবিলে বসে চা খাচ্ছে—তার নিঃশব্দে চাবি খোলা ও বাড়িতে ফেরার জন্যে প্রস্তুত ছিল না যেন। চোখ তুলেই এমনভাবে নামিয়ে নিল যেন ভয় পেয়েছে। দু' এক মুহূর্তের জন্যে হলেও হঠাৎ আবেগে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল আনন্দর নিঃশ্বাস। নিজের সন্তানকে অচেনা লাগছে কেন? কাল একেই সে খুন করার কথা ভেবেছিল, বাধা দেওয়ায় চড় মেরেছিল স্ত্রীকে, জীবনে প্রথম। চিন্তাগুলো এলোমেলো করে দিতে নিজেকে সংযত করে এর পর সে ঘরে ঢুকে সীমার মুখোমুখি হয়। কাল সীমা মেয়েকে বাঁচানোর কথা বলেছিল—বলেছিল অনেক কিছু জানা বাকি আছে। কী জানতে চেয়েছিল সীমা?

ভাবনা দানা বাঁধল না। শব্দটা ফিরে আসছে আবার। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আনন্দ দেখল, শিংঅলা বাইসনের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে ছুটে আসছে টোটা। গায়ের লাল শার্টের সঙ্গে বাইকের রং আলাদা করা যায় না। একেবারে তার গায়ের ওপর এসে প্রচণ্ড জোরে ব্রেক করে দাঁড়াল।

'দেখুন, দাদা, ছোঁড়াটার লাশ ফেলে দেওয়া কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু ওসবে এখনই যাবো না। জানাজানি হলে পার্টির বদনাম হতে পারে।' টোটার দু' পা বাইকের দু'দিকে ছড়ানো; দু' মুঠোর চাপ খেলা করছে হ্যান্ডেলে। সামান্য সন্দেহের চোখে আনন্দর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ছেলেদের বলে দেবো নজর রাখতে। এক মাস হসপিটালে থাকার ব্যবস্থা করে দেবো। তাতেই শিক্ষা হবে। ব্যস, আপনার মেয়ে সেফ, আপনিও সেফ।'

'ঠিক আছে। তুমি যা ভালো বুঝবে।' আনন্দ এরই মধ্যে ভয় পেতে শুরু করেছিল। অনিশ্চিত গলায় বলল, 'আমি তাহলে যাই—'

'দাঁড়ান।' বাইক থেকে নেমে এলো টোটা, 'ঠিক কী করেছে বলুন তো। পেট-টেট ফাঁসায়নি তো?'

ক্ষমাহীন গলা। রন্দাটা ঠিক জায়গাতেই মেরেছে। আনন্দ টের পেল, এক মারেই ছড়িয়ে যাচ্ছে চিন্তাগুলো। অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে ছেয়ে যাচ্ছে মাথা। সেই প্রথমবার, কাছা ধরে টান দেবার সময় যেমন হয়েছিল। কোনোরকমে নিজেকে জড়ো করে সে বলল, 'না, না। সেসব কিছু নয়।'

'আপনি ঠিক বলছেন বিশ্বাস করব কি করে?'

'কী বলছ! বাপ হয়ে মিথ্যে বলব!'

'বাপ বলেই বলবেন। মেয়েটা ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে ঘুরত, আমিও দেখেছি। আগে জানতে পারেননি?'

আনন্দ চুপ করে থাকল।

'শুনুন। অ্যাকশন যা নেবার আমি নেবো। তার আগে আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই। কাল পাঠিয়ে দিন ওকে।' আবার বাইকে চড়তে চড়তে বলল টোটা, 'ঠিক আছে? কখন পাঠাবেন?'

'এসব করার দরকার আছে?'

'না করলে সেফটি কোথায়? ওই ছোকরা এসেই যাবে, ঝামেলা করবে।'

'তাহলে বাড়িতে এসো!'

'না।' জোর দিয়ে বলল টোটা, 'বৌদি আমাকে পছন্দ করে না। যে-কথা বলছি শুনুন। কাল বিকেলে পাঁচটায় মেয়েকে পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে। কথা বলব। এখানেই, আমি ক্লাবে থাকব—। না এলে মরুন শালা মেয়েকে নিয়ে।'

টোটা চলে গেল।

শব্দটা গেঁথে গেছে মাথায়। যাচ্ছে না। ভট্-ভট্-ভট্-ভট্। সেই একই শব্দ নিয়ে পরিচিত প্রায়ান্ধকারের মধ্যে দিয়ে বাড়ি ফিরল আনন্দ। একই বিমূঢ়তা নিয়ে। এবং সীমার একা হবার অপেক্ষা করতে লাগল।

'তুমি ভেবেছ কি!' প্রশ্ন নয়, বিস্ময়ও নয়, আনন্দর কথা শুনে ঘৃণায় ধারালো হয়ে উঠল সীমার চোখ। স্বামীকেই দেখছে।

থমকানো ভাব কাটিয়ে বলল, 'আমার মেয়ে কি বেশ্যা যে, যে ডাকবে তার কাছেই যেতে হবে!'

'এসব কথা উঠছে কেন!'

'উঠবে—সেইজন্যেই উঠছে—।'

'আস্তে।' আনন্দ বলল, 'টোটাকে অবিশ্বাস করার কারণ নেই। ও আমাদের অনেক উপকার করেছে—'

'রাখো। আমি ওকে তোমার চেয়ে ভালো চিনি।'

'তার মানে!'

সীমা হঠাৎই গুটিয়ে নিল নিজেকে। তারপর বলল, 'সেবার বাড়িওলার ঘটনার পর লোকটা আরো একদিন এসেছিল। তোমরা বাড়ি ছিলে না। ঝি ছিল। চা খেতে চাইল। দিলাম—।' পরের কথাটা বলবার আগে নিঃশ্বাস নিল সীমা, আঁচল টানল বুকে। বলল, 'আমার হাত ধরে টেনেছিল—আমি ওকে বেরিয়ে যেতে বলি—'

'একটা চড় মারলে না কেন?'

'চড়ই মারতাম। পরে মনে হলো তোমার যদি কোনো ক্ষতি করে!'

আনন্দ মিলিয়ে দেখল। এখন বুঝছে টোটা কেন বলেছিল বৌদি পছন্দ করে না। ঠিক বুঝতে পারল না এই মুহূর্তে যে-রাগটা আসছে, সেটা কার ওপর।

সীমাকেই দেখল।

'আমাকে বলোনি কেন?'

'তোমাকে! কী লাভ হতো! প্রতিশোধ নিতে?'

'দরকার হলে নিতাম।'

'রাখো!'

আনন্দর মনে হলো আবার ঘৃণায় ফিরে আসছে সীমা। কিছুটা পিছু হটে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার জন্যেই এই সব। খাল কেটে কুমিরটাকে তুমিই ঢুকিয়েছিলে। এখন সবাইকেই গিলবে!'

আনন্দ জানে না সে এখন কী বলবে। ডোবার একটা ধরন আছে, অসহায়তার মধ্যে সেই ধরনটাকেই আঁকড়ে ধরল সে।

সীমা ফিরে এলো। কিছু শান্ত গলায় বলল, 'দোলনকে বুঝিয়েছি। ও ভুল বুঝতে পেরেছে। এখন কিছুদিন ও পার্ক

সার্কাসে মামার বাড়িতে থাকবে। এখন দেখছি কাল সকালেই সরিয়ে দিতে হবে।'

'আমি কী করব!' আনন্দ বলল, 'না হয় টোটার কাছে আমরাও যেতাম ওর সঙ্গে। না গেলে আমাকেই মারবে!'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে স্বামীকে দেখল সীমা। ঘৃণাও নয়। সময় নিয়ে বলল, 'যার এত মৃত্যুভয় তার মরাই উচিত।'

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

পরের দিন সকালে খুব সতর্কতার সঙ্গে মেয়েকে পাচার করে দিয়ে বাড়ি ফিরে এল ওরা। আনন্দ অফিসে গেল না। নিঃশব্দ থেকে নিজেকে দূরত্বে সরিয়ে রাখল সীমা। দুজনের কেউই বুঝল না কে কী ভাবছে। এবং এইভাবে সময় পেরিয়ে যেত দিল।

বিকেল পাঁচটার পর থেকেই বুকের মধ্যে আতঙ্ক চিনতে শুরু করল আনন্দ। ছটা বাজল, সাতটাও বেজে গেল। তখন ভাবল, ফটফটিয়ার শব্দ তুলে উড়ে যাবার আগে টোটা বলেছিল—'না এলে মরুন শালা মেয়েকে নিয়ে।' এমন কি হতে পারে কাল ওই কথাগুলোর যে-অর্থ সে করে এসেছে তা ভুল? এমনও তো হতে পারে যে, টোটা বোঝাতে চেয়েছিল দোলনকে না পাঠালে আনন্দর মেয়ের ব্যাপারে সে আর নাক গলাবে না, সুদেব যা করবার করবে। যদি তা-ই হয়, তাহলে টোটার কাছে সে আর যেতে পারবে না কখনো, কিন্তু এই আতঙ্ক থেকে বাঁচবে। এই ভেবে সীমার কাছাকাছি বিছানায় শুয়ে নতুন অনিশ্চিতিতে জড়াতে লাগল সে।

ঠিক সেই সময় শুনতে পেল শব্দটা। আসছে; ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ভয়ে পিঠ খাড়া করে উঠে বসল আনন্দ। এবং লক্ষ করল সীমাও উঠে দাঁড়িয়েছে।

'যদি আসে, আমিই দরজা খুলব।'

'তুমি!'

'হ্যাঁ, আমিই!' শব্দটা নীচে এসে থামতে হঠাৎই বদলে গেল সীমার মুখের রেখাগুলো। আনন্দকে দেখতে দেখতে বলল, 'আমাকে কিছু করার আগে ভাববে ও।'

পায়ের শব্দ উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। বিছানা থেকে নেমে

দাঁড়াল আনন্দ। দরজায় বেল পড়তে এগিয়ে যাবার আগে সীমা বলল, 'যা বলব শুনবে—'

তারপর সে দরজা খোলবার জন্যে এগিয়ে গেল।

টোটাই। এক মুহূর্ত সীমার দিকে তাকিয়ে দূরে দাঁড়ানো আনন্দকে দেখে চাপা গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'বেরিয়ে আয় শুয়োরের বাচ্চা! লাথি মারব পেটে। দু'ঘণ্টা ওয়েট করিয়েছ আমাকে— খবরও দাওনি! শালা, টোটাকে চেনোনি! সব জানি আমি।'

সীমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল টোটা। সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে ফেলল সীমা। টোটার হাত চেপে ধরে বলল, 'চুপ করো। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। এত রাগ করার কী আছে?'

'ওসব ছেনালি রাখুন। না হলে গায়ে হাত তুলব।' টোটা হাতটা ছাড়িয়ে নিল।

সীমা হঠাৎই আরো বেশি করে ঘিরে ধরল টোটাকে। বলল, 'বাড়িতে এসেছ, আমার সঙ্গে কথা বলো। মেয়েকে আমিই সরিয়ে দিয়েছি। ও কিছু জানে না। এসো, বসবে এসো।'

'ভড়কি দেবেন না।' ঘাবড়ে যাওয়া মুখে টোটা বলল, 'আপনার স্বামীকে বাইরে আসতে বলুন। না হলে খুনখারাপি হয়ে যাবে এখানে।'

'কিচ্ছু হবে না। ও বেরিয়ে যাচ্ছে। তুমি থাকো।' সীমা আবার হাত চেপে ধরল টোটার। আনন্দর কাছে অপ্রত্যাশিত গলায় বলল, 'কেন বোঝো না, তোমার ভরসাতেই আছি আমরা। এসো, ভেতরে এসো—'

আনন্দ জানে সীমা এখন কী করবে। জানে, প্রতিবাদ আর তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যু। কাল সীমার কান্না শুনেও উপলব্ধি করেনি সে সত্যিই ভয় পায় মৃত্যুকে, সীমাও তাকে মরতে দিতে চায় না। এখন বুঝে, পায়ে চটি গলিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো সে। অন্ধকারে।

নীচে দাঁড়িয়ে আছে টোটার ফটফটিয়া। আবার যখন শব্দটা উঠবে, সে ঠিকই শুনতে পাবে। ফিরেও আসবে। আর নিশ্চয়ই সীমা তার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাবে না।

নীলা

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, ঝড় মাঝে মাঝেই ওঠে, থেমেও যায়। কিন্তু কাল যেমন হলো, এর আগে কখনোও তেমন হয়েছে বলে মনে করতে পারে না নীলা। এক বিছানায় শুলেও মাঝখানের দূরত্ব বাড়িয়ে রেখেছিল অসীম। ভোর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে নীলা দেখল, অসীম বিছানায় নেই—ছোট ফ্ল্যাটের ব্যালকনির চেয়ারে মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে আছে চুপচাপ। ওর ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পেরেছিল অনেকক্ষণই এভাবে বাইরে। হয়তো ঘুমোয়ওনি।

মন কষাকষির ব্যাপারটা যাতে আরো দূর না গড়ায় সেজন্যে নিজে থেকেই এগিয়ে গিয়েছিল নীলা। বলতে গেলে ক্ষমাই চেয়েছিল। তারপর কথায় ফিরলেও সম্পর্কটা স্বাভাবিক হয়নি এখনো।

নীলা বুঝতে পারছিল দোষটা তারই। যাতায়াতের রাস্তায় পড়ে বলে ক'দিন সে অফিসে তার বস শ্যামলেন্দুর গাড়িতেই যাচ্ছে। তার আর অসীমের অফিস আলাদা, বাড়ি থেকে কখনো একসঙ্গেই বেরোয় দুজনে, কখনো না। তারপর যে যার মতো বাসে বা ট্রামে উঠে পড়ে। গত দু'দিন নীলার সঙ্গে অসীমকেও বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভদ্রতাবশত নীলার স্বামীকেও গাড়িতে তুলে নিয়েছিল শ্যামলেন্দু। কালকের ঘটনা, গাড়িতে যেতে যেতেই শ্যামলেন্দু হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিল অসীমকে, 'আপনাদের তো অনেক বড় অফিস, স্টাফদের ট্রান্সপোর্ট দেয় না?' কথাটা শুনে হঠাৎই কেমন হয়ে গেল অসীম। পরে বলেছিল, 'অফিস বড় হলেও আমার চাকরিটা তত বড় নয়—'

এরপর বৃষ্টির মধ্যেই অফিসের কাছাকাছি রাস্তায় নেমে গিয়েছিল অসীম। শ্যামলেন্দু ওর অফিস পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চাইলেও লিফ্‌ট নেয়নি। সন্ধেয় বাড়ি ফিরে নীলা দেখল অসীম বদলে গেছে। শুধু শ্যামলেন্দুকেই নয়, নিজের স্ত্রীকেও সহ্য করতে পারছে না আর। খুব ঠাণ্ডা গলায় নীলাকে বলেছিল, 'তুমি যেভাবে চলছ সেইভাবেই চলো—আমি বাধা দেবো না। তবে আমাকে এভাবে না জড়ালেও

পারতে !'

আজও ট্রামরাস্তা পর্যন্ত একসঙ্গেই এলো দুজনে। পাশাপাশি না হলেও প্রায় পাশাপাশি হেঁটে। কথা বলল না কোনো। গত দু'দিনের মতো হলে আরো একটু এগিয়ে বাসস্টপের কাছাকাছি তাদের দাঁড়াবার কথা।

'তুমি তো এগোবে—,' অসীম হঠাৎ বলল, 'আমার ট্রাম আসছে। আমি চলি—'

রাস্তা পার হবার জন্যে দৌড় দিল অসীম।

নীলা দেখল, জোরে ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে একটা ট্রাম। অসীম তখনো রাস্তার মাঝখানে, অসীমকে চাপা দেবার জন্যে একটা নীল অ্যামবাসাডার ছুটে আসছে দ্রুত—অসীম ও গাড়িটার মধ্যে ব্যবধান হাত খানেকের বেশি নয়। প্রচণ্ড ব্রেক কষার শব্দ হতেই চোখ বন্ধ করল ও। পরের মুহূর্তেই চোখ খুলে দেখল ট্রামের ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে অসীম। সে যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই, প্রায় সমান্তরাল রেখায়, এগিয়ে যাচ্ছে নীল অ্যামবাসাডারটা। দুটোই দৃষ্টির বাইরে চলে যাবার পর নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেল নীলা। চোখ ফেরাল না।

তুমি যেভাবে চলছ সেইভাবেই চলো—আমি বাধা দেব না, সকালে বলেছিল। তখন কথাটার মানে বোঝেনি। এখন ভাবল, অসীমকে ওইভাবে ছুটতে দেখে সেও বাধা দেয়নি ; আতঙ্কে চোখ বন্ধ করেছিল মাত্র। হয়তো এটাই ঠিক, কারও বাধা দেওয়া বা না দেওয়ার ওপর নির্ভর করে না কিছু—ভাগ্যই যাকে যেদিকে ইচ্ছে নিয়ে যায়। হয়তো অসীমও তা-ই ভাবে এবং সেইজন্যেই মুখ ফুটে বলেছিল। অসীম কি গতকালের ঘটনায় অনুমান করেছে কিছু, কিংবা আশঙ্কা ?

সকাল থেকে সেই যে মেঘ করেছে, এখনো, রোদ ওঠেনি। হঠাৎ টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হলো। সঙ্গে ছাতা থাকলেও নীলা সেটা ব্যবহার করার কথা ভাবল না। আলগোছে কব্জি তুলে ঘড়ি দেখল, প্রায় ন'টা। শ্যামলেন্দুর এর মধ্যে এসে যাবার কথা। বাঁ দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ডানদিকে তাকাল, ট্রাফিক সিগন্যালে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে অনেকগুলো গাড়ি। প্রাইভেট গাড়ি, ট্যাক্সি, ডাবল-ডেকার,

মিনি, সবই আছে, ওই জটলার মধ্যে অ্যাশ কালারের কোনো ফিয়াট চোখে পড়া সম্ভব নয়। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে, কপালে বৃষ্টির রেণু অনুভব করতে করতে, একইরকম উদাসীনতা নিয়ে সে শুধু ভাবতে লাগল, একটু আগে অসীমের দুর্ঘটনা ঘটে গেলে কী হতো!

নীলা নিজের মনেই উত্তর খুঁজল। কিছুদিন অসহায় লাগত, তারপর হয়তো সয়ে যেত। হঠাৎ হার্ট-অ্যাটাকে স্বামী মারা যাবার মাস দুয়েকের মধ্যে তার আগের অফিসের মল্লিকা দত্ত সামলে নেয় এবং স্বভাবিক হয়ে ওঠে। হাতে চাকরি ছিল, বাড়ির অবস্থাও খারাপ নয়। মল্লিকার স্বামী সুশোভন দত্ত বড় চাকরি করত। প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি নিয়ে যা পায় সবটাই ফিক্সড্ ডিপোজিট করে দেয় ব্যাঙ্কে। দু'টি ছেলেমেয়েকেই ভর্তি করে দেয় কনভেন্টে। তারপর, এক বছরের মধ্যেই সে আবার বিয়ে করার কথা ভাবে। মারা গেছে বলেই একটু খারাপ লাগে—,' একদিন বলেছিল, 'ডিভোর্স হলে কী হতো!'

নীলার মুখে এসব শুনে অসীম বলেছিল, 'বিয়েটা কারও কারও কাছে অভ্যাস। বেশির ভাগ লোকই টেনে চলে, তাই কিছু হলে দাগ কাটে না।'

'অভ্যাস কাকে বলে?'

'কী জানি! মায়াও বলতে পারো। কিংবা টান। বাড়িতে কুকুর বিড়াল পুষলে তাদের ওপরেও টান এসে যায়।'

নীলা মেনে নিতে পারেনি। চিরে দেখতে দেখতে কথাগুলোর খেই হারিয়ে ফেলে। অসীমকে বলেছিল, 'তুমিও তাই ভাবো নাকি?'

'আমাদের কথা বলিনি। আমি কারও কারও কথা বলেছি—'

এই মুহূর্তেও, রাস্তায় দাঁড়িয়ে, আমাদের এবং কারও কারও মধ্যে তফাতটা গুলিয়ে ফেলল নীলা এবং ভাবল, মল্লিকার মতো তারও চলে যেত। তবে আবার বিয়ে করার কথা ভাবত কি?

গত বছর ডিসেম্বর মাসে প্রোমোশন ও একসঙ্গে পাঁচশো টাকা ইনক্রিমেন্টের চিঠি পেয়ে অসীমকে দেখানোর পর অসীম বলেছিল, 'আর কি! তুমি তো এখন আমার চেয়ে বড়লোক। এরপর আমাকে আর পাত্তা দেবে না!'

খুশি হয়েছিল কিনা বোঝা যায়নি। তবে স্বামীর নিরুত্তাপ ব্যবহার লক্ষ করে মনে মনে একটু দমে গিয়েছিল নীলা। ক্ষোভও সামলাতে পারেনি।

'মাইনে বাড়ার সঙ্গে পাত্তা দেওয়া না দেওয়ার কী সম্পর্ক !'

'মাইনে বোলো না। বলো টাকা। গোনা যায়।' অসীমের হাসিতে কখনো কখনো সহজেই ব্যঙ্গ মিশে যায়, তখন ও আরো ধারালো হয়ে ওঠে। বলেছিল, 'যা গোনা যায় তাই-ই ভয়ঙ্কর। শেষ দেখা যায় না।'

এই কথার পর নীলা ধরে নিয়েছিল অসীম খুশি হয়নি। কিছুটা বিরক্ত হয়েই বলেছিল, 'অত বুঝি না। আমার টাকা ভালো লাগে, ভালো থাকতে ভালো লাগে।'

সম্ভাব্য অ্যাক্সিডেন্টের ছবিটা সামনে রেখে এখনো ও ভাবল, অসীম যা-ই মনে করুক, চাকরিটাই বাঁচিয়ে দেবে তাকে। কিন্তু, তাহলেও কি সমস্যা যাবে ?

সমস্যা হবে মেয়ে টিনাকে নিয়ে। যতদিন না পুরোপুরি বড় হয়ে ওঠে টিনা আর ওর একটা ব্যবস্থা হয়, ততদিন সারাক্ষণ টিনার কথা ভেবে যেতে হবে তাকে। একটা উপায় অবশ্য আছে, ওকে দাদার কাছে রাখা যায়। ওইটুকু মেয়ে, ওকে এখন থেকেই মল্লিকার ছেলেমেয়েদের মতো হস্টেলে পাঠানো যায় না।

অ্যাশ কালারের ফিয়াটটা সামনে এসে দাঁড়ানোর পরেও নিজেকে ফেরাতে পারল না নীলা। খেয়াল হলো শ্যামলেন্দুর গলা শুনে।

পিছনের দরজা খুলে ধরে শ্যামলেন্দু ডাকল, 'আসুন—'

হতচকিত ভাব নিয়েই সাধারণের চেয়ে ব্যস্তভাবে গাড়িতে উঠে পড়ল নীলা। এবং ভাবল, এই গাড়িতে ওঠা নিয়েই অশান্তি ; আজ কি সে আসামীকে বলতে পারত না আমি তোমার সঙ্গে যাবো—ট্রামে-বাসে, যাতেই হোক ! ট্যাক্সি চড়ার সঙ্গতিও তো আছে তাদের ! অসীম অপমানিত বোধ করলে সে করেনি কেন ! তাহলে কি শ্যামলেন্দুর সঙ্গই তাকে আকর্ষণ করছে বেশি ! নাকি পাছে শ্যামলেন্দু কিছু ভাবে, চাকরিতে অসুবিধে হয়, এই ভাবনাই বাধ্য করছে তাকে !

দরজা বন্ধ করার আগে নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে কী ভাবল শ্যামলেন্দু।

'আপনার স্বামী কোথায় ?'

'চলে গেছে—।' বলেই ধাতস্ত হলো নীলা। চোখ নামিয়ে বলল, 'আজ ওর তাড়া ছিল।'

'ও।' শ্যামলেন্দু বলল, 'তাহলে আপনি পিছনে বসবেন কেন! সামনে আসুন। কথা বলার সুবিধে হবে—'

শ্যামলেন্দু বলার আগেই কথাটা মনে হয়েছিল নীলার ; শ্যামলেন্দু না বললে নিজে থেকে বলত না। কাল অসীম সামনে বসেছিল, শ্যামলেন্দুর পাশে, সে পিছনে। আজকের পরিস্থিতি অন্য, সে পিছনে বসবে কেন! ব্যাপারটা ভালোও দেখায় না।

দ্বিরুক্তি না করে নেমে এলো নীলা এবং শ্যামলেন্দুর পাশে গিয়ে বসল। অল্প অন্ধ, অন্যমনস্ক চোখদুটো সামনেই থাকল। নতুন কোনো কথা মনে পড়ল না। গাড়িটা চলতে শুরু করার পর ও শুধু ভাবল, টিনাকে তার সমস্যা মনে হলো কেন! দাদার কাছে রাখার কথাই বা ভাবল কেন!

'ভিজে গেছেন মনে হচ্ছে ?'

'সামান্য।' আঁচলের ওপর থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির রেণুগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে নীলা বলল, 'যেতে যেতেই শুকিয়ে যাবে।'

'আমার একটু দেরি হলো। ট্রাংককল বুক করেছিলাম, এলোই দেরিতে।' কৈফিয়তের গলায় শ্যামলেন্দু বলল, 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন ?'

নীলা অনুমান করল, পরিষ্কার পাশ ফিরে তারই দিকে তাকিয়ে আছে শ্যামলেন্দু। সুতরাং তাকাল না। ঘাড় নাড়ল, যার অর্থ 'না'। তারপর ঘড়ি দেখল। অন্তত মিনিট পনেরো সে দাঁড়িয়েছিল। আশ্চর্য, এতটা সময়ের মধ্যেও একবারও সে চলে যাবার কথা ভাবেনি কেন ?

ভিজে চকচকে রাস্তা। গাড়ি কাচের ভিতর দিয়ে কেমন অন্য-রকম লাগে। গতি বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আধখোলা জানলা দিয়ে

ছুটে আসা হাওয়ায় অবাধ্য হয়ে ওঠে কানের পাশের চুলগুলো। দু'হাত দিয়ে চেপেচুপে সেগুলোকে যথাস্থানে বসাবার চেষ্টা করল নীলা। বাঁ হাতটা নামাল না—হাওয়া এড়ানোর জন্যে সরে বসল একটু। তখনই বৃষ্টি নামল জোরে। বড় বড় ফোঁটাগুলো কাচের ওপর ভেঙে, অপেক্ষাহীন ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে। দেখতে দেখতে নিঃশ্বাস ভারী হয়ে উঠল নীলার।

ওয়াইপার চলছে। হঠাৎ এমন মুষলধারায় বৃষ্টি নাববে ভাবা যায়নি। এমন কি পাঁচ গজ দূরেও ঝাপ্সা লাগছে সবকিছু। গাড়িতে ওঠার আগে যেটুকু ভিজেছিল, হঠাৎ বৃষ্টির ছাঁট লেগে তার চেয়ে বেশি ভিজে গেল নীলা। ব্যস্তভাবে আধখোলা জানলার কাচটা ওঠাবার চেষ্টা করল।

ও কাচটা ওঠাতে পারছে না দেখে গাড়ির গতি কমিয়ে ঝুঁকে এলো শ্যামলেন্দু।

ছোট গাড়ি, জায়গাও ছোট। নীলা দেখল শ্যামলেন্দুর মাথা তার বুকের সেই জায়গায় এসে পড়েছে, যেখান থেকে কাল রাতে—মনোমালিন্য শুরু হবার পর—সে ফিরিয়ে দিয়েছিল অসীমকে। আরো স্পর্শ বাঁচানোর জন্যে এখন সে যেদিকে ঝুঁকবে সেটা শ্যামলেন্দুরই দিক। নিজেকে সরিয়ে নেবার আগে নীলা ওর চুলের গন্ধ পেল, সেই সঙ্গে পোড়া তামাকের গন্ধ। চারদিক বন্ধ বলে বেশ কিছুটা রাস্তা গন্ধটা ঘিরে থাকল তাকে।

শ্যামলেন্দু নয়, নীলা ভাবছিল অসীমের কথা। ট্রাম থেকে নেমে কিছুটা রাস্তা হেঁটেই যেতে হবে ওকে। সঙ্গে ছাতা নেয়নি, যদি বৃষ্টিটা ঝেঁপে নামবার আগে না পৌঁছে থাকে, তাহলে ভিজবে। তার অনেক আগে চলে গেলেও এখনো না পৌঁছনোরই কথা। ট্রাম আর গাড়ির গতি এক নয়।

'এত চুপচাপ যে!'

'এমনি।'

'এমনি!' ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল শ্যামলেন্দু। নিঃশব্দে। সামনেটা ঝাপ্সা বলেই সম্ভবত ফিরে তাকাল না। বলল, 'ঝগড়া করেছেন নাকি?'

'না !'

সঙ্গে সঙ্গে আর কিছু বলল না শ্যামলেন্দু। ট্রাফিকে থেমে থাকা গাড়িগুলো সিগন্যাল পেয়ে আবার চলতে শুরু করার পর অনায়াসে গাড়িটাকে ফাঁকায় বের করে এনে বলল, 'সংসার মানেই শুনেছি অশান্তি। সেদিক থেকে আমি ভালো আছি—'

নীলা হাসল, জোর করেই। শ্যামলেন্দু এখনো ব্যাচেলার, সে জানে ; আরো একবার জানল। শ্যামলেন্দু নিশ্চয়ই উত্তর চায় না।

নীলা চুপ করে আছে দেখে শ্যামলেন্দু বলল, 'আমি কালই ভেবে ছিলাম একটা ট্রাবল হবে।'

'কী ব্যাপারে !'

'কালকের ইনসিডেন্টের পর মিস্টার চৌধুরী—আই মিন আপনার স্বামী—নিশ্চয়ই ইনসাল্ট ফিল করেছিলেন। আপনাকে যদি কিছু বলে থাকেন আশ্চর্য হবো না।'

'কিছুই বলেননি।' প্রয়োজনের চেয়ে দ্রুত কথাগুলো বলল নীলা।

'বলেননি ! আশ্চর্য !'

শ্যামলেন্দু হঠাৎ চুপ করে গেল। বৃষ্টির বেগ কমে এসেছে, স্বচ্ছ লাগছে আশপাশ। ওয়াইপার বন্ধ করে, কয়েক সেকেন্ড দেখে আবার চালু করল শ্যামলেন্দু।

নীলা রাস্তা চেনে। এখান থেকে দুশো গজের মধ্যে রাস্তার ওপরেই অসীমের অফিস। তার আগেই ডানদিকে বাঁক নেবে তারা। আরো তিন-চার মিনিট গেলে তাদের অফিস। বাঁকের আগে পৌঁছে দৃষ্টি তীক্ষ্ন করলেও সে দেখতে পেল না কাউকে।

'আজ উনি এলেন না কেন ! এমন বৃষ্টি—আমি স্বচ্ছন্দে নামিয়ে দিতে পারতাম।'

'সেটা ওঁর ব্যাপার। তাড়া ছিল, বললাম তো !'

'তা নয়।' শ্যামলেন্দু বলল, 'এক একজনের এক একরকম ইগো থাকে। কিংবা সেনসিটিভ জায়গা। একটুতেই জ্বালা করে—'

শ্যামলেন্দুর গলার স্বরে জাদু আছে, যখন যা বলে শুনতে ভালো লাগে। যখন যাই বলুক, মনে হয় এই কথাগুলি বলবার জন্যে ও

অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। এই সম্মোহন নীলা বেশ কিছুদিন ধরেই চিনেছে। কিন্তু, মন ভালো নেই বলেই সম্ভবত, আজ শ্যামলেন্দু তাকে স্পর্শ করতে পারল না। মনে হলো সে পাশে থাকার সুযোগে অকারণে অনধিকার চর্চা করে যাচ্ছে শ্যামলেন্দু।

বিরক্ত হলেও নিজেকে প্রকাশ করা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারল না নীলা। যতই হোক, সে এখন শ্যামলেন্দুর গাড়িতে; যেমনই হোক, শ্যামলেন্দু তাকে সিঁড়ি চিনিয়েছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে চাকরিতে ক্রমশ ওপরে উঠবে সে। যতদূর সম্ভব। সে উঠলে অসীমও উঠবে, এইভাবেই ভেবে এসেছিল এতদিন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার ভাবনায় একটু ভুল থেকে গেছে কোথাও।

আর একটু পরেই তারা পৌঁছে যাবে অফিসে। বৃষ্টিও থেমে এলো। ইতস্তত করতে করতে হঠাৎ বলে ফেলল নীলা, 'ইগো হোক, আর যাই হোক, আমার স্বামীর সমালোচনা করার অধিকার কে দিল আপনাকে ?'

রাশ টেনে বলবে ভেবেও গলার ঝাঁঝ লুকোতে পারল না নীলা। বলেই মনে হলো, এ প্রশ্নটা সে এড়িয়ে গেলেও পারত।

শ্যামলেন্দু জবাব দিল না। তার দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল শুধু। চোখাচোখি হতে নীলা লক্ষ করল, হাসিটা মিলিয়ে যাচ্ছে, তার বদলে ওর চোয়াল জুড়ে জায়গা খুঁজছে কাঠিন্য।

ওরা পৌঁছে গিয়েছিল। গাড়ি থেমে দাঁড়াতে নীলা নেমে এলো এবং আঁচল গোছাতে গোছাতে দেখল, পার্কিং স্পেসে গাড়িটা রেখে দ্রুত লিফ্‌টের দিকে হেঁটে যাচ্ছে শ্যামলেন্দু, যেন নীলা পৌঁছুবার আগেই সে উঠে যেতে চায়।

নীলা নিজেকে মন্থর করে নিল। একটা অনুভূতি আসছে, কিসের ঠিক বুঝতে পারল না। শুধু মনে হলো, বাড়ি থেকে সে একাই বেরিয়েছিল, এখনো একাই যাচ্ছে।

মিসফিট

কলকাতা শহরের মধ্যেই এরকম একটা ফ্ল্যাট যে সত্যি সত্যিই পেয়ে যাব, তা কোনোদিন ভাবিনি আমরা। খুব বেশি চাহিদা তো ছিল না। শুধু ওই ঘিঞ্জি থেকে উঠে আসা, একটু খোলামেলা জায়গায় নিজের মতো করে থাকা। আর হ্যাঁ, ভাড়াটা যেন হিসেবের বাইরে চলে না যায়।

খুঁজতে খুঁজতে হন্যে হবার জোগাড় হয়েছিল। হতাশাও এসে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত পাওয়াটা তাই বাড়তি সুখ এনে দিল।

আমি যত না খুশি, তার চেয়ে বেশি দোলা। নতুন ফ্ল্যাটে দিন দু'তিন যেতে-না-যেতেই বলল, 'সত্যি, তোমার বাপু পছন্দ আছে। সেদিন বাড়ি ফিরে যখন বললে একটা ফ্ল্যাট ফাইনাল করে এসেছ, তখন কিন্তু এতটা ভাবিনি। রাগও হয়েছিল অল্প—আমাকে একবার দেখালে না পর্যন্ত!'

'দেখলে হয়তো এটাও বাতিল করতে তুমি। একটা না একটা খুঁত খুঁজে পেতে।' দোলাকে খোঁচা দেওয়ার লোভটা সামলাতে পারলাম না আমি। বললাম, 'তোমাকে তো চিনি!'

দোলা বলল, 'এখন যা বলবে মেনে নেব।'

চুপচাপ থাকার মধ্যে দোলার খুশি ছুঁয়ে গেল আমাকে। ব্যালকনিতে বসে আকাশের ওপারে আকাশ দেখতে দেখতে একটু পরে বললাম, 'কিন্তু ভাড়াও কম দিতে হবে না। গুনে গুনে আঠারোশো টাকা। মাস গেলে মনে হবে কয়েকটা পাঁজরা খসে যাচ্ছে।'

'কেন, অফিস দেবে তো?'

'সে তো হাজারখানেক। বাকিটা—'

'অমন করে বোলো না।' কথার মাঝখানেই আমাকে থামিয়ে দিল দোলা। অভ্যাসবশত শাড়ির আঁচলে কপালের ঘাম মোছার ভঙ্গি করে আমার পাশে এসে বসতে বসতে বলল, 'কী আর এমন বেশি পড়ল তোমার! এত বড় প্রোমোশন হলো, মাইনে বাড়ল, সেগুলোও

বলো !'

দোলার হিসেবে ভুল থাকে না। কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে থাকলাম আমি।

'ভাড়া অবশ্য একটু বেশিই।' শুধরে নেওয়া গলায় দোলা বলল, 'কিন্তু বাড়িটা কী ভাল! একেবারে নতুন। সারাদিন দেওয়ালের নতুন পেন্টের গন্ধ, দরজার ভার্নিশের গন্ধ নাকে লাগছে!'

'তা না হয় হলো।' টাকার দুঃখটা হঠাৎই পরিণত হলো বিলাসে। আরো কিছু বলবার আগে দ্রুত করে একটা সিগারেট ধরালাম আমি, যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলাম দোলাকে। তার চোখ আকাশের দিকে—হাত দুটো বেণী-ঝোলানো কিশোরীর ধরনে কোলের ওপর ছড়ানো। এই ভঙ্গিতে তারা গোনার কথা ভাবা যায়। ওকে দেখতে দেখতে বললাম, 'শ-পাঁচেক বেশি যাবে। ওই টাকায় দুধ আর মাসকাবারি দোকানের বিলটা মিটিয়ে ফেলতে পারতাম। এখন থেকে ওগুলো বাড়তি খরচ। তার ওপর ধরো ও বাড়িতে তিনটে ঘর ছিল, এখানে আড়াইটে। খাবার ব্যবস্থা প্যাসেজেই করতে হচ্ছে—'

'সব সুবিধে কি একসঙ্গে পাওয়া যায়!' আমার দিকে না তাকিয়েই জ্যোৎস্নার আলোয় ঘাড় নাড়ল দোলা, 'যায় না। জায়গা একটু কমল, কিন্তু পাড়াটা দ্যাখো। ক'জনই আর যোধপুর পার্কে থাকতে পারে আজকাল। তাছাড়া, এ পাড়ায় একটাও গরিব লোক নেই। মাসের শেষে চৌধুরীমশাই তোমার কাছে ধার চাইতে আসবেন না।'

দোলার কথায় খুব স্বাভাবিকভাবে হাসি এসে গেল। হাসির মধ্যেই পেরিয়ে এলাম কালীঘাট থেকে যোধপুর পার্কের দূরত্ব। ওর কথার খেই ধরে বললাম, 'বড়লোকদের পাড়ায় এসে এরপর আমিই হয়তো চৌধুরীমশাইয়ের রোল নেব! তোমার কি আলাপ-টালাপ হয়েছে এখানে? কার কাছে হাত পাতা যায় সেটাও খুঁজে দেখ—'

'সব ব্যাপারে রসিকতা ভালো লাগে না।' দোলা বলল, 'এতই যদি তোমার টাকার শোক, তাহলে ও বাড়িটা ছাড়তে গেলে কেন! নিশ্চয়ই আমার জন্যে নয়! নিজেই তো বলতে ওখানে কেমন মিসফিট লাগে!'

এটা দোলার অভিমানের সময়। ও চুপ করে যেতে আমার নাকে এসে লাগে ওর শরীরের গন্ধ। টানে ভরে উঠি আমি। হাত বাড়িয়ে কাছে টানার চেষ্টা করতে সামান্য ছটফট করল দোলা, মুহূর্তের আড়ষ্টতা ছুঁয়ে গেল ওকে। তারপরেই পরিচিত স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'এখানের একটা মস্ত সুবিধে এখনো তোমার মাথায় ঢোকেনি—'

'কীরকম!'

'এই যে—এই ব্যাপারটা—।' আমার স্পর্শ থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে দোলা বলল, 'এখন যা করছ। মনে নেই, পাশের বাড়ির সাহাদের বেহায়া ছেলেটা দিনরাত পায়চারি করত ছাদে, যখন-তখন উঁকি দিত ঘরের মধ্যে! একবার কী একটা ছুঁড়েছিল! বাব্বা, নিশ্চিন্তে জামাকাপড় পর্যন্ত বদলাতে পারতাম না!'

'সাহাদের ছেলেটার জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে! ওই তোমাকে সবচেয়ে বেশি মিস করবে। বেচারা!'

'না, ঠিক বলেছি কিনা বলো?' দেলো আমার অনুমোদন খুঁজল, 'এতরকম সুবিধের পরেও কি টাকাটা তোমার কাছে—'

'টাকা নয়, টাকাটা খুব বড় ফ্যাক্টর নয়।' আশ্বস্ত করার জন্যে বললাম আমি, 'আসলে পুরনো অ্যাসোসিয়েশনের মর্ম ছেড়ে এলে বোঝা যায়। কিছু কিছু অনুষঙ্গ থাকে—যার সঙ্গে জড়িয়ে যায় নিঃশ্বাস। ছেড়ে এলে মনে হয় কী একটা মিস করছি!'

'ফিলজফি!' দোলা আমাকে এগোতে দিল না। এখন ও স্নানে যাবে। উঠে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আচমকা হাওয়ায় ওর শাড়ির আঁচল উড়ে এলো আমার মুখে। সেটা সামলে নিয়ে বলল, 'ক'টা দিন অপেক্ষা করো। এই ফ্ল্যাটও পুরনো হয়ে যাবে।'

দোলা চলে যেতে আর একটা সিগারেট ধরালাম আমি। হয়তো ওর কথাই ঠিক। নতুন পরিবেশে রপ্ত হবার আগে পেয়ে বসে আলস্য, তখন মনে হয় এ জায়গাটা পরিচিত নয়, সুতরাং পাকাও নয়। ভিজে তুলোর ধরনে চাপ হয়ে ধোঁয়াটা নামতে থাকল গলা বেয়ে। বসে বসেই শুনতে পেলাম বাথরুমের দরজা বন্ধ করছে দোলা, সেই শব্দ; তারও একটু পরে জলের নরম শব্দ। চারপাশের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে

শোনা বলেই দ্বিতীয় শব্দটা একটু অন্যরকম লাগল কানে। ট্যাপ নয়, শাওয়ার। ঝুঁকতে হবে না, বালতিতে প্লাস্টিকের মগ ডুবিয়ে ঘাড়ে মাথায় জল ঢালার অসুবিধে নেই। স্পষ্ট টের পেলাম, ঝিরঝিরে জলের নীচে টানটান দাঁড়িয়ে স্নানে সতেজ হয়ে উঠছে দোলার শরীর। মিসফিট কথাটা একটু আগেই বলেছিল দোলা। আমিও কি ভাবিনি! কিন্তু, কেন! এই বিলাসিতাগুলো কি আমাদের প্রাপ্য নয়! নতুন পাওয়া সুখে অভ্যস্ত হতে হতে পুরনো সংস্পর্শগুলো ভুলতে কত আর সময় লাগবে! আজ সকালেই দোলা বলছিল, 'পুরনো ফ্ল্যাটের কিছু কিছু জিনিস ফেলে দেব। ওগুলো মানাবে না এখানে।'

এক চিন্তা থেকে অন্য চিন্তায় ঢুকে যেতে সময় লাগে না। বসে বসেই আমি ভাবতে লাগলাম কী ফেলব, কী কী মানিয়ে যাবে এখানে। ও বাড়িটা কী এমন খারাপ ছিল, ভাবলাম। জল নিয়ে একটু অসুবিধে হতো অবশ্য। তাছাড়া ঘিঞ্জি, আর দোলা যা বলল, কিছুটা বেআব্রু, প্রাইভেসির অভাব ছিল। এ বাড়ির কথা শোনা যেত ও বাড়ি থেকে। মাসের শেষদিকে একদিন চিকেন বিরিয়ানি রাঁধছিল দোলা—নিজের কানে শুনেছি আমি, পাশের বাড়ির দত্তগিন্নি চেঁচিয়ে বলছিল তার কর্তাকে, খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, দোলার বরের বোধহয় প্রোমোশন হয়েছে। এইরকম আরো অনেক কথা, কৌতূহল কিংবা কানাকানি। বিরক্তিতে, কখনো বা ঘৃণায়, ছটফট্ করতাম আমরা।

ওই পরিবেশে, ওই সংস্পর্শের মধ্যে থেকে আমরাও কি ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম ক্রমশ! সংস্পর্শ এড়াবার জন্যেই কি তাড়াতাড়ি চলে এলাম যোধপুর পার্কের এই ছিমছাম ফ্ল্যাটে! নতুন করে বাঁচার জন্যে, নাকি যা ছিলাম তার চেয়ে অন্যরকম—একেবারেই নতুন হবো বলে! ঠিক জানি না।

দোলা কখন তৈরি হয়েছে খেয়াল করিনি। এবারের চা-টা আনল মভ্‌রঙের সুন্দর ট্রে-তে। আগে কখনো চোখে পড়েনি এটা। অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকাতে খবরের কাগজে চায়ের বিজ্ঞাপনের ছবি থেকে আমার সামনে উঠে এলো দোলা। অবিকল একই ভঙ্গি। এতদিন ও হাতে হাতেই এগিয়ে দিত চায়ের কাপ—একটু আগেও দিয়েছিল সেইভাবে, আঙুলে আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি হতো কখনো। আমি

নতুন কোনো ফিলজফি ভাবলাম না। ট্রে থেকে চায়ের কাপটা আলগোছে তুলে নিয়ে বললাম, 'নিউ অ্যাডিশন মনে হচ্ছে!'

'ঠিক ধরেছ। নতুনই।' দোলা জানে কখন কীভাবে হাসতে হয়। বলল, 'দুপুরে একটা ফেরিউলি এসেছিল। এই ট্রে-টা আর একটা জলের জাগ রাখলাম। মাত্র দুটো পুরনো শাড়ির বদলে। দেখবে জিনিসটা?'

'থাক এখন—।' বললাম 'এ পাড়াতেও ফেরিউলি! আশ্চর্য তো!'

'কোন পাড়া আর বাদ দেয় ওরা। তবে এখানে বেশি সুবিধে করতে পারে না। বেশির ভাগেরই গাড়িটাড়ি আছে। তাছাড়া, কাছেই 'দক্ষিণাপণ'—ওখানে ভ্যারাইটি কত!'

'তুমি আর ফেরিউলি ডেকো না। লোকে হাসাহাসি করবে. ভাবতে পারে—'

'এই তো, একবারই!' কথা থামিয়ে প্রশ্রয় খুঁজল দোলা, 'ট্রে-টা তোমার পছন্দ হলো না?'

'হয়েছে। রঙটা ভালোই।'

'পছন্দ আমার কোনোদিনই খারাপ নয়, মশাই। সামনের মাসে একটা টি-সেট কিনব। না বোলো না। বাড়িতে লোকজন এলে চা দেবার মতো ভালো কাপ নেই। একটু গুছিয়ে নিই, তারপর তোমার বন্ধুবান্ধবদের ডেকো।'

'ডাকব। আজ পূর্ণেন্দু বলছিল বউ নিয়ে আসবে একদিন। ঠিকানা নিল।'

দোলা আমাকে দেখল। কিছু বা অখুশি গলায় বলল, 'উনি ছাড়া তোমার আর বন্ধু নেই!'

'কেন!'

'এতদিন বিয়ে হয়ে গেল, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দু'তিনজনকেই দেখাচ্ছ শুধু। সেই পূর্ণেন্দু আর দিলীপ আর বিষ্ণু! কী ছাই পরিচয় তোমার!'

'পরিচয় অনেক, বন্ধু আর ক'জন হয়!' দোলার কথায় নিশ্চয়ই অপ্রস্তুত হয়েছিলাম আমি। ভাবটা সামলাবার জন্যে বললাম, 'দু'চারজনকে আলাদা করে নিতেই হয়। বিপদে আপদে যারা কাছে

কাছে থাকবে—'

'আমার ভালো লাগে না। নতুন জায়গায় এসেও যদি সেই পুরনো মুখ—! মিসফিট! কেমন যেন গাঁইয়া সব! তোমার সঙ্গে মানায় না।'

দোলার ক্ষোভের কারণ বুঝতে পেরে চুপ করে থাকলাম। খুব কি ভুল বলেছে ও! হঠাৎ মনে হলো, সত্যি-সত্যিই একটা রুচির অভাব যেন থেকে যাচ্ছে কোথাও। বাড়ি বদলালেই কি আর নিজেদের বদলানো যায়! সম্ভবত আমাকে নতুন সঙ্গ খুঁজতে হবে।

এরই মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে পাড়া! আশপাশ আড়াল হয়ে ছিল এতক্ষণ, আমরা থামবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল নৈঃশব্দ্যের বিস্তার। হাওয়ায় ঘুম। আমি চোখ বন্ধ করলাম, খুললাম আবার। প্রায় সাদা আকাশ আর বহুদূরবিস্তৃত নক্ষত্রের পটভূমি, চোখে পড়ল সামনের ছাদে খেজুর গাছের ছায়া, ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের ভিতর দিয়ে নতুন চাঁদের তৎপর দৌড়। পৃথিবী কি বরাবর এরকমই ছিল! এই পরিবেশে দোলা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, সব স্মৃতি ভুলে এই মুহূর্তে এই পরিবেশটাকেই আঁকড়ে ধরতে চায়, আমি কি দোষ দেব ওকে!

আমার ভাবনার সুযোগে দোলাই কথা বলল আবার।

'তুমি কি রাগ করলে?'

'না।' স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য বেশি হেসে বললাম, 'তুমি ঠিকই বলেছ। একঘেয়ে জীবন কারই বা ভালো লাগে!'

'এই বাড়িটা আমার খুব ভালো লাগছে! কেন জানি না, সারাক্ষণই নতুন কিছু করতে ইচ্ছে করছে—'

জ্যোৎস্নায় সরল দেখাচ্ছে দোলাকে। ওকে দেখতে দেখতে বললাম, 'এখানে তোমার একা লাগে না?'

দোলা ঘাড় নাড়ল। লাগে। তারপর যেন এই একাকিত্বটাই স্বাভাবিক, সেইভাবে বলল, 'নতুন জায়গা। আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে যাবে—'

'ওখানে তোমার অনেক চেনাজানা হয়ে গিয়েছিল। আর কেউ না হলেও রেখামাসীরা ছিল, কমলা ছিল—চোখের সামনে কাউকে না কাউকে দেখতে পেতে সবসময়। আর বাচ্চাগুলো! তোমার ওদের

কথা মনে পড়ে না ?'

'পড়ে।' যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত হলো দোলা। খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'যাই বলো, এখানে এসে কিন্তু বেঁচে গেছি। ওরা ধরেই নিয়েছিল আমরা ওদেরই মতো—কোনোরকমে দিন কাটে। কমলা একদিন বলল, দোলাদি, বাড়ি খুঁজলেই তো হয় না। ভালো ফ্ল্যাট চাইলে টাকাও দিতে হবে ভালো—আমাদের মতো মানুষ তা পেরে উঠবে কেন! কী কথা! যেন আমাদের হাঁড়ির সমস্ত খবর ওর জানা, টাকায় কুলোয় না বলেই ওদের সঙ্গে গিয়ে থাকছি!'

জবাব না দিয়েই হাসলাম আমি। একটু শব্দ হয়েছিল, ক্ষুব্ধভাবে তাকাল দোলা।

'তুমি হাসছ! আমার কিন্তু রাগ হতো তোমারই ওপরে। আসবার আগে কমলাকে বলে এলাম, একদিন নতুন ফ্ল্যাটে ঘুরে যাস। ভাড়ার রসিদটা দেখাব তোকে।'

'ছিঃ, দোলা! দ্যাটস ব্যাড।' প্রায় দুঃখিত গলায় বললাম আমি, 'এটা না বললেও পারতে। কমলা তো অন্যায় বলেনি কিছু। একটা সুখের যোগান দিতে গিয়ে এখন কত সুখ হাতছাড়া হয় দ্যাখো।'

'হবে না। কিচ্ছু হবে না।' প্রবলভাবে বলল দোলা, 'বড় হতে হলে নজরটাকেও বড় করতে হয় একটু। দ্যাখোই না কীভাবে ম্যানেজ করি—'

শুধু দোলাকেই নয়, বাড়ি-বদলের জের আমাকেও বদলাতে লাগল ক্রমশ। পূর্ণেন্দু বারদুয়েক কথাটা তোলা সত্ত্বেও কায়দা করে এড়িয়ে গেছি ওদের নতুন ফ্ল্যাট দেখতে আসার ইচ্ছে। ট্রাফিক জ্যামের জন্যে একদিন অফিস থেকে ফেরার সময় পুল-কার ঘুরে এলো কালীঘাটে আমাদের পুরনো বাড়ির সামনে দিয়ে, ইচ্ছে হয়েছিল নেমে পড়ে দেখা করে যাই। তারপর ভাবলাম, পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি! নতুন ফ্ল্যাটে এসেছিলাম মে মাসের গোড়ায়। এখন পরিষ্কার বুঝতে পারি, মে মাসে যেমন ছিলাম, জুনে তার চেয়ে বদলে গেছি খানিকটা, জুলাইয়ে আরো। দুজনকে নিয়ে আমাদের এই সংসার আগেও ছিল, কিন্তু এর আগে কখনো এমন তৎপরতা লক্ষ্য করিনি সেখানে।

দোলা কাজের মেয়ে। সকালে বেরিয়ে যাই চাকরিতে, সন্ধেয় ফিরে প্রায়ই দেখি ঘরের কোথাও না কোথাও পরিবর্তন হয়েছে কোনো। সামান্য হলেও যোগ হয়েছে কিছু-না-কিছু। আগে যা ভাবতেই পারতাম না, এখন সপ্তাহে একদিন অন্তত কাছেপিঠের কোনো রেস্তোরাঁয় চাইনিজ বা অন্য কিছু খেতে যাই আমরা। বার-দুয়েক পার্ক স্ট্রিটেও গেছি। এ পাড়ার লেডিজ ক্লাবের মেম্বার হয়েছে দোলা। সেই সুবাদে পাড়ার মধ্যে পরিচয়ও বাড়ছে দ্রুত। এইভাবে বদলাতে বদলাতে ক্রমশ অন্যরকম হয়ে যেতে লাগলাম আমরা। বাড়িটাও পুরনো হয়ে গেল।

সেদিন অফিস থেকে বেরুবার আগে বৃষ্টি নামল জোরে। বাড়ি ফেরার ঝামেলা হতে পারে ভেবে হাতের কাজগুলো সেরে নিলাম তাড়াতাড়ি। ইচ্ছে, আজ পুল-কারে না ফিরে নতুন আসা ডেপুটি এম-ডি সিনহা সাহেবের গাড়িতে লিফ্‌ট নেব। ভদ্রলোক যোধপুর পার্কেই থাকেন জেনে ইদানীং ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছিলাম। ইচ্ছে আছে, সুযোগ বুঝে একদিন সস্ত্রীক বাড়িতে ডাকব তাঁকে।

মতলবটা মাথায় পাকা হবার মুহূর্তে চোখের সামনে প্রায় ভূত দেখে চমকে উঠলাম। চৌধুরীমশাই!

পুরনো পাড়া ছাড়ার পর আর দেখিনি ওঁকে। এই চার মাসে আরো কিছুটা বুড়ো হয়েছেন। পুরু কাচের চশমার ভিতর চোখ-দুটো অস্পষ্ট। কিছু না জানিয়ে এমন হুটহাট চলে আসে কী করে! আমি স্পষ্টই বিরক্ত হলাম। চোখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার! হঠাৎ!'

বসতে না বললেও সামনের চেয়ারটা টেনে নিজেই বসলেন চৌধুরীমশাই। কাশলেন একটু। তারপর বললেন, 'খুব ব্যস্ত?'

'হ্যাঁ, ব্যস্ত তো বটেই। এখুনি একটা মিটিংয়ে বেরুতে হবে—'

ভদ্রতা বাঁচিয়ে যেটুকু তাচ্ছিল্য করা যায় করলাম। খুব কাজ হলো বলে মনে হলো না।

'আর একদিন এসেছিলাম, তুমি ছিলে না। শুনলাম তোমার নাকি আরো উন্নতি হয়েছে?'

জবাব দিলাম না। ততক্ষণে মনে মনে একটা অঙ্ক কষে ফেলেছি

আমি—নানা অজুহাতে এ পর্যন্ত আমার আছে কত টাকা ধার নিয়েছেন তিনি এবং শোধ দেননি, তার হিসেব। শ-পাঁচেক তো হবেই। কিছু বেশিও হতে পারে। হয়তো আজও এসেছেন একই ধান্ধায়। এই এক ধরনের লোক, লজ্জাহীন, ধরেই নেয় অমুকের অবস্থা আমার চেয়ে ভালো, সুতরাং হাত পাতি! ঠিক করলাম, আজ টাকা চাইলে পরিষ্কার বলে দেব, চৌধুরীমশাই, আমি দানছত্র খুলে বসিনি। আমাকেও গতর খাটিয়ে রোজগার করতে হয়। আপনি অন্য কোথাও দেখুন।

পাত্তা না পেয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন চৌধুরীমশাই। তারপর হঠাৎ বললেন, 'তোমার কাছে এসেছিলাম, বাবা, একটা দরকারে—'

'টাকা চাই?'

'না, না। টাকা নয়।' অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন চৌধুরীমশাই, 'টাকা তো অনেক নিয়েছি, সব মনে আছে। ব্যাপারটা হলো—'

টেবিলের ওদিকে লুকনো হাতটা বের করে আমার দিকে একটা লম্বা খাম বাড়িয়ে দিয়ে অল্প হাসলেন চৌধুরীমশাই।

'আমার সেজো মেয়ে লক্ষ্মীকে তো দেখেছ? ওর বিয়ে দিচ্ছি। হঠাৎই ঠিক হলো। ছেলেটি মন্দ নয়। ব্যাঙ্কে চাকরি করে। ধারধোর করেই দিচ্ছি। কন্যাদায় তো! তা তোমাদের নেমতন্ন করে গেলাম। বাড়ির ঠিকানা জানি না, জানলে বাড়িতেই যেতাম। এসো দয়া করে—স্বামী-স্ত্রী দুজনেই—'

'খুব ভালো খবর!' কথাগুলো বলতে গিয়ে সামান্য গলা কেঁপে গেল আমার, 'দোলাকে বলব।'

'হ্যাঁ, বোলো। যদি পারে গায়ে-হলুদেও আসতে বোলো সকালে।'

চৌধুরীমশাই বসলেন না। উঠতে উঠতে বললেন, 'দরিদ্রের সংসার বলেই হিমসিম খেতে হয়। কাজ কি একটা! এই বয়সে দৌড়ঝাঁপও পারি না আর।'

লিফ্‌ট পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম ওঁকে। বাইরে তাকিয়ে বুঝলাম তেমন জোর না থাকলেও বৃষ্টিটা চলছে এখনও।

চৌধুরীমশাইয়ের কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ, হাতে ছাতা। লিফ্‌ট আসার আগে হঠাৎ মনে পড়ার ধরনে বললেন, 'কমলা মারা গেছে শুনেছ নিশ্চয়ই ?'

'কমলা !' সোজাসুজি ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কোন কমলা ? রেখামাসীর মেয়ে ?'

'হ্যাঁ।' দুঃখিত ভঙ্গিতে চোখ তুললেন চৌধুরীমশাই, 'কী যে হলো, রোগটা বুঝবার সময় পর্যন্ত দিল না। কেন, তুমি জানতে না !'

আমার হাঁটু কাঁপতে শুরু করেছিল। নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে ক্রমশ থেমে এলো গলার কাছে। অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। একটা বিবর্ণ পোস্টকার্ড ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে—'মা দোলা, আমাদের বড় বিপদ। কমলা ভীষণ জ্বরে ভুগিতেছে, ভুল বকিতেছে। যদি পারো জামাইকে সঙ্গে লইয়া একদিন আসিও—'

লিফ্‌টের খাঁচার মধ্যে অবিকৃত দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে নেমে গেলেন চৌধুরীমশাই। অন্যমনস্ক আমি, ফিরে এলাম নিজের জায়গায়।

বাড়ি ফিরে খবরটা দিলাম দোলাকে। বললাম, 'খবর পেয়েই যাওয়া উচিত ছিল। হাজার হোক—। সত্যি, অন্যায় হয়ে গেল বড়—'

দোলার মুখ ফ্যাকাশে। বলল, 'চিঠিটার কথা বলোনি তো ওঁকে ?'

'না।'

'ভালো করেছ। বললে খারাপ হতো—'

সেই মুহূর্তে দোলার সঙ্গে চোখাচোখি হলো আমার। কী জানি কেন, দ্রুত চোখ নামিয়ে শোবার ঘরের দিকে হেঁটে গেল দোলা। খানিক পরে ও-ঘরের আলো নিভতে দেখলাম।

ব্যালকনিতে চেয়ার টেনে বসলাম আমি। একা। সিগারেট ধরালাম একটা। জুত লাগল না তেমন। দোলা এখন কী ভাবছে, আদৌ কিছু ভাবছে কিনা জানি না। কিন্তু, আমার হঠাৎই মনে হলো, ঠিক এইভাবেই কি বদলাতে চেয়েছিলাম আমরা ? তাহলে কেন মনে হচ্ছে এই জায়গাটাও আমাদের নয় !

'ফিলজাফি', বলবার জন্যে আজ দোলাকে কাছে পেলাম না।

নিষিদ্ধ ত্রিভুজ

পুলকের কাছে শীলাই সবচেয়ে জরুরি। এসে পর্যন্ত এমন ব্যবহার করছে যাতে মনে হবে শশাঙ্ক কেউই নয়, খাতায় কলমে যদিও সে শীলার স্বামী এবং এ বাড়িতে গৃহস্বামী।

অবশ্য পুলক যে তা জানে না তা নয়। বরং একটু বেশিই জানে। তাহলেও শশাঙ্ক সম্পর্কে উদাসীন ভাবটুকু সে কিছুতেই গোপন করতে পারে না।

আলাপটাকে তাই সৌজন্য ছাড়া বেশি দূরে নিয়ে যেতে পারেনি। যেমন, ট্রেন থেকে নেমেই সে শশাঙ্কর শরীর-টরিরের খবর নিয়েছিল, প্যাকেট খুলে সিগারেট বাড়িয়ে দিয়েছিল, বাড়ি থেকে ফ্যাক্টরি কত দূরে, নাইট ডিউটি দিতে হয় কি না এইসব জিজ্ঞেস করে তার পরের কথার অভাবে এক সময় জিজ্ঞেস করেছিল, 'আর সব খবর কী ?'

তার প্রশ্নে শীলা আসেনি একবারও। শশাঙ্ককে স্বীকার করে নিলেও শশাঙ্ক-শীলাকে জড়ায়নি একসঙ্গে। তেমনি শশাঙ্কর জিপে চড়ে বাড়িতে পৌঁছনোর পর থেকেই যেন আলাদা করে দিয়েছে শীলাকে।

শশাঙ্ক যে কিছু মনে করছে তার ভাবভঙ্গি দেখে অন্তত তা বুঝবার উপায় নেই। কাঠ বা পাথরের মতোই তার অস্তিত্বে মনে-করা ব্যাপারটি একেবারেই অনুপস্থিত। 'যার মন নেই সে আবার মনে করবে কী ?' শশাঙ্কর বিরুদ্ধে শীলার এই পাঁচ বছরেব অনুযোগই বোধহয় সত্যি হলো।

সে যাই হোক, পুলক আসছে খবর পেয়েই তাকে অভ্যর্থনা জানাবার আয়োজন করতে উঠে পড়ে লেগেছিল শশাঙ্ক। শীলার দুর্বলতা আছে জেনেও পাঁচ বছর পরে হঠাৎ পুলকের আসবার কারণ কী তা জানবার জন্যে কৌতূহলও দেখায়নি।

শশাঙ্কর চরিত্রের এই ব্যাপারটা অসহ্য লাগে শীলার। বিয়ের পর পাঁচ বছরে নিজের পছন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করে বারবার হার স্বীকার

করেছে সে। এবারের ব্যাপারটা অবশ্য একটু আলাদা। মনে হচ্ছে পুলক উপস্থিত বলেই হারের বোঝাগুলো জোর করে শীলার ওপর চাপিয়ে দিতে চায় শশাঙ্ক।

মনের জ্বালা তাই সারাক্ষণই উত্তপ্ত করে রাখছিল শীলাকে। তারপর, পুলক স্নান করবে বলে শশাঙ্ক নিজেই যখন কুয়ো থেকে জল তুলতে গেল, তখন আর নিজেকে সামলাতে পারল না শীলা।

'এই লোক-দেখানো আদিখ্যেতাগুলো কি না করলেই নয়!' শীলার গলার ঝাঁঝ বেশ স্পষ্ট।

'আদিখ্যেতা বলছ কেন!' মুখে চাপা হাসি নিয়ে শশাঙ্ক বলল, 'কর্তব্যও তো বলতে পারো।'

'তোমার কর্তব্যবোধ যে কত তা তো আমি জানি!' শীলা বলল, 'ঘরের লোককে চিরকাল পায়ে ঠেলে আজ পরের জন্যে তোমার কর্তব্যবোধ জেগে উঠল হঠাৎ!'

'পর বলেই করছি। ঘর আর পরকে এক করি কী করে!'

পুলক বোধহয় কাছেই ছিল। স্বামী-স্ত্রীর বাক্যালাপ শুনতে না পেলেও অনুমানে বুঝেছিল কিছু একটা চলছে। প্রথমে শীলার, তারপর শশাঙ্কর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হলো কী! দাম্পত্য কলহ মনে হচ্ছে!'

বোতল উপুড় করে জল ঢালার শব্দের মতো শশাঙ্কর উৎকট খলখলে হাসি এবার সোজাসুজি বিঁধল শীলাকে। উপায় থাকলে বুকের ভিতর শেকড়বাকড়ের মতো চেরা দাগগুলো এখন সে দেখাতে পারত।

'ও-জন্যে ব্যস্ত হবেন না।' হাসির জের টেনেই শশাঙ্ক বলল, 'শরতের মেঘ। দু'এক পশলা বৃষ্টির পরেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'কথাগুলো আগেও শুনেছি মনে হচ্ছে!' পুলকের ভূমিকা এখন বাগে-পাওয়া সুযোগ-সন্ধানীর। সুযোগটা কাজে লাগাল।

'শুনেছেন বইকি। নাটকে।' একটুও অপেক্ষা না করে মুখস্থ করা জবাবের মতো শশাঙ্ক বলে গেল, 'নতুন কথা বলবার মতো বিদ্যেবুদ্ধি কি আমার আছে! আমি কনজারভেটিভ। বাঁধা রাস্তায় চলি।'

এ কথার অনেক রকম মানে হয়। অন্তত শীলার তাই মনে হলো। পুলকও অপ্রস্তুত। শীলার স্বামী বলেই শশাঙ্ক নামের লোকটির প্রতি সারাক্ষণই বিরক্ত থাকে সে। পাল্টা কথার তল খুঁজে পায় না কোনো।

শীলা ও পুলকের এই মুহূর্তের অনুভব শশাঙ্ককে স্পর্শ করেছে বলে মনে হয় না। নির্বিকার কাজ করার ধরন দেখেই বোঝা যায় সে শ্রম ভালোবাসে। একটা নেভি ব্লু হাফপ্যান্ট ছাড়া সাড়ে পাঁচফুট শরীর ও পেটা স্বাস্থ্যের সবটাই উন্মুক্ত। এই মুহূর্তে ওর বুকভর্তি রোমের দিকে তাকিয়ে গা শিরশির করে উঠল শীলার। পাঁচ বছরে সে যে কত দীন ও অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়েছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না তার।

গল্পটা এইখানেই শুরু করা যায়। শশাঙ্ক ও পুলকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অসম্ভব দোটানায় পড়েছে শীলা। সময় অল্প।

দেখতে দেখতে ঘন হলো দুপুর। বাইরে জিপ দাঁড়িয়ে, চোদ্দ মাইল দূরের ফ্যাক্টরিতে শশাঙ্ক এখন ডিউটি দিতে যাবে। পাঁচ বছরের অভ্যাসে অনুগত স্ত্রী শীলার হাত থেকে ফ্লাস্কটা নিয়ে বেরোবার আগে শশাঙ্ক বলল, 'কলকাতা থেকে এত দূরে দু' এক-দিনের জন্যে আসার কী মানে হয়! পুলক আরো ক'দিন থাকলে তোমারও ভালো লাগত—'

'থাকা না-থাকাটা তার ইচ্ছে। আমার ভালো লাগার কী আছে এতে!'

'তাহলে তো আমাকেই ভালো লাগাতে হয়।' আড়চোখে একবার স্ত্রীকে দেখে নিল শশাঙ্ক, 'নিজেই একবার বলে দেখি—'

'তোমার বলাবলির কিছু নেই। গেলে যাবে—'

কথাগুলো বলেই অবশ্য শীলা বুঝেছিল ভুল করেছে। শশাঙ্কর পরের কথাটার জন্যে সে তৈরি হয়েই থাকল।

'অতই সহজ নাকি!' অল্প থেমে বলল শশাঙ্ক, 'জোরটা তোমার হয়ে আমিই না হয় খাটিয়ে আসি।'

শশাঙ্ক আর দাঁড়াল না। শীলা দেখল, সে পুলকের ঘরেই ঢুকছে। পাঁচ বছর আগে হলে দুই প্রতিপক্ষের মাঝখানে দাঁড়ানোয়

সে উৎসাহ বোধ করত। সেসব দিন এখন কোথায়!

ঘরের মধ্যে থেকেই শশাঙ্কর জিপ স্টার্ট হওয়ার শব্দ শুনল শীলা। আলস্যের সঙ্গে জ্বালা, অপমানের সঙ্গে অসহায়তা মিশে ঝিমঝিম করছে শরীর। উদাসীন হাতে দরজায় খিল তুলে দিল সে।

বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে এখন সে অনেক কিছুই ভাবতে পারে। দুপুরের রোদে রুক্ষ চড়াই-উতরাই পেরিয়ে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে শশাঙ্ক। অক্লেশে। স্টিয়ারিং ধরলে ওকে গাড়ির অঙ্গ বলেই মনে হয়—মেশিন, কলকব্জা, স্টিয়ারিং, হুড, চাকা ইত্যাদি নিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্ব। মনে হয় ভবিষ্যতে স্বয়ংক্রিয় গাড়ির চালক যেমন হতে পারে ও হবেও হয়তো, তারই মডেল ও। বিয়ের পর নতুন জায়গায় এসে নতুন সংসর্গে কিছুদিন আপোসের চেষ্টা চালিয়েছিল শীলা। তবে ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি। একদিন শশাঙ্কর সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে হঠাৎই আবিষ্কার করেছিল গাড়ির মধ্যে সে একা, ভীষণভাবে একা; মন্ত্রপূত গাড়ি যেন তাকে টেনে নিয়ে চলেছে নিরুদ্দেশের রাস্তায়।

ব্যাপারটা খেয়াল হতেই শশাঙ্কর হাত চেপে ধরেছিল শীলা।

'গাড়ি থামাও—'

'হঠাৎ!'

কথাটা কানে বেজেছিল। কথা না বলে শব্দ বলাই ভালো, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে শশাঙ্কর মুখ থেকে বেরোনো সেটাই প্রথম কথা ও শব্দ।

প্রতিবাদের রক্ত তখনো হয়তো ছিল শরীরে। এমনও হতে পারে নিজেকে আবিষ্কারের ধাক্কাতেই প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছিল শীলা। তৎপর উত্তর ফুটতে দেরি হয়নি।

'না হয় গাড়িই চালাচ্ছ। তা বলে এরকম অমানুষ হয়ে থাকার কী আছে!'

'অমানুষ!' শশাঙ্ক বলল, 'মেয়েমানুষ বলেই বোধহয় নরম করে বললে। লোকে বলে অতি মানুষ।'

হাসিতে বোতল উপুড় করে জল ঢালার উপমাটি কি সেদিনই

খুঁজে পেয়েছিল প্রথম ? মনে পড়ে না ঠিকঠাক।

শীলা নিঃশ্বাস চাপল। সমস্ত অভিজ্ঞতার ভার এখন তার বুকের ওপর বসে, পরবর্তী নিঃশ্বাসও বেরোবার পথ খুঁজছে। সে কি নিঃসঙ্গ! সে কি অসহায়! সময় কি সত্যই তার জন্যে প্রস্তুত! দ্বিধান্বিত এইসব প্রশ্ন ক্রমশই তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে শূন্যতার দিকে। পুলক নাগালের মধ্যে আছে বলেই শূন্যতা আরও বেশি।

অথচ এরকম কথা ছিল না। বহুদিনের চাপা বিক্ষোভ থেকেই সাহস সঞ্চয় করেছে পুলক। শশাঙ্ক না জানুক, আকর্ষণহীন এই দূর শহরে পুলকের হঠাৎ আবির্ভাবের কারণ শীলা নিশ্চয়ই জানে। নাকি জানে বলেই অসঙ্কোচে মেলে ধরার পরিবর্তে ক্রমশ নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে সে ?

ফেলে-আসা রাস্তায় সম্ভবত একটু দ্রুতই হাঁটছিল শীলা। না হলে পুলকের স্পষ্ট গলার স্বর এই সময় তার কানে পৌঁছত।

দরজায় সজোরে টোকা পড়তেই সম্বিত ফিরে পেল সে। অলস হাতে দরজা খুলল। সামনে পুলক। মুখচোখের পরিচ্ছন্ন ভাব দেখে মনে হয় নিশ্চিত হয়েই এসেছে।

কয়েক মুহূর্ত শীলার বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে পুলক বলল, 'যেভাবে দরজা বন্ধ করেছিলে, ভাবনা হচ্ছিল কিছু করেটরে বসলে নাকি !'

ওকে ঘরে ঢোকার সুযোগ দিয়ে শীলা বলল, পাঁচ বছরে যখন কিছু করিনি, আজ হঠাৎ ও-কথা ওঠে কী করে !'

'তাহলে কি আমাকেই ভয় পাচ্ছ !'

'তোমাকে !' শীলার হাসিতে ম্যাচুরিটির আভা। নিজেকে গুছিয়ে নেবার জন্যেই সময় নিল। বলল, 'একদিন তো দরজা খোলাই ছিল, পুলক। তখন কি ভয় পেয়েছিলাম !'

জট ছাড়াবার এটাই উপযুক্ত সময়। পুলকও তা বুঝতে দেরি করল না। শীলার একটা হাত হঠাৎ ধরে ফেলে বলল, 'পাঁচ বছরে এমন কী দেরি হয়ে গেছে, শীলা! একটা অমানুষের স্মৃতি ভুলে

যাওয়া কী আর এমন শক্ত !'

শীলা জবাব দিত হয়তো। পুলকের স্পর্শেই সাহস পেতে শুরু করেছিল সে। কিন্তু তার আগেই দুরন্ত শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল।

ক্লাইম্যাক্স এইভাবেই আসে। হ্যাঁ, শশাঙ্কই। ফ্যাক্টরিতে কী একটা গণ্ডগোল হয়েছে, ফিরতে রাত হবে। দেড়টা দুটোর আগে তো নয়ই।

আশ্চর্য ! ফোন করার আর সময় পেল না ! নাকি অসম্ভবকে প্রত্যক্ষ করা অতিমানুষ শশাঙ্কর আর এক খেলা !

সে যাই হোক, অসময়ের এই টেলিফোনই পুলক আর শীলার খেই-হারানো নাটকের শেষ সূত্রটি ধরিয়ে দিল। ইতিমধ্যে আরো সাহসী আর বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল শীলা। এখন নির্ভয়। মনঃস্থির করার এমন সুযোগ ক্বচিৎ আসে।

বুদ্ধিটা শীলাই জোগাল। তৎপরতা দেখে মনে হয় হঠাৎ পাঁচ বছর বয়স কমে গেছে তার।

রাত বেশি হবার আগেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল পুলক। জিনিসপত্র বলতে একটা সুটকেস। ওরই মধ্যে শীলার প্রয়োজনীয় দুএকটা শাড়ি-জামা ভরে নিল। রাত একটা নাগাদ একটা ট্রেন আছে। পুলক তো বলেইছিল চলে যাবে।

শশাঙ্কর পৌঁছুতে দেরি হবে। বাকি রাতটুকু ও বেলা পর্যন্ত তার বেহুঁশ ঘুমের সময়। পাঁচ বছরে আর কিছু না পারুক, শশাঙ্কর অভ্যাসগুলো ঠিকই চিনে নিয়েছে শীলা। ভোরের ট্রেন ছাড়ার আগে অপেক্ষারত পুলকের সঙ্গী হতে কী আর এমন অসুবিধে হবে তার !

এরপর পরিকল্পনা মতোই এগোবে সব। সময়ও।

পুলক রওনা হয়ে যাবার পর নিজের ভাঙাচোরা অস্তিত্ব জুড়তে বসল শীলা। এতক্ষণ সবই করেছে ঝোঁকের মাথায়। অন্ধকার ও সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শশাঙ্কর ফিরে আসার অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ অনুভব করল, পাঁচটা বছর খুব দ্রুত কাটিয়ে এসেছে সে। এই মুহূর্তের অপেক্ষাও কেটে যাবে। ভাবতে ভাবতেই ক্রমশ শশাঙ্ক

আর পুলকের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সে।

এইভাবে শুরু হওয়া গল্পের শেষও থাকে।

পুলক তখনো অপেক্ষায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছুবে ট্রেন। তুমুল শব্দে স্টেশনের ঘণ্টা বেজে উঠতেই দূর ডিসট্যান্ট সিগন্যালের দিকে তাকাল পুলক। আর হয়তো দু'তিন মিনিট। কিন্তু শীলা কোথায়!

সারা রাত নির্জন প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করার ধকল নিয়ে পুলক এবার ধৈর্যের সীমান্তে এসে পৌঁছুল। এমন নয় যে শীলা ট্রেনের সময় জানে না। আর, যাবার আগ্রহ তার চেয়ে শীলারই কি বেশি ছিল না?

শীলা কি আসবে? যদি না আসে!

প্ল্যাটফর্মের অন্যান্য যাত্রীদের চাঞ্চল্য দেখে মনে হয় ট্রেন আসছে। হ্যাঁ। আসছে।

মনের এই বেখাপ্পা অবস্থার মধ্যেই দূর থেকে কাছে শীলার অবয়ব ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল পুলকের চোখে।

ট্রেন এসে গেছে। শীলা কি আরো একটু দ্রুত হতে পারে না! সব জেনেশুনেও এমন মন্থর, নিরুদ্বেগ ভঙ্গি নিয়ে কেমন করে হাঁটতে পারে শীলা! পুলক অধৈর্য হয়ে পড়ল।

'আমি যেতে পারছি না, পুলক।' ততক্ষণে কাছে এসে গেছে শীলা। বলল, 'ভেবে দেখলাম এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না।'

যাত্রীদের অস্থির কোলাহল ও ব্যস্ততার মধ্যে শীলার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর মূক করে দিল পুলককে। চেনাশোনা অভিজ্ঞতার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে না তাকে।

'কী বলছ!'

সেই মুহূর্তে পুলকের চোখের দ্ব্যর্থহীন উদ্বেগ ওই ক্ষীণ প্রশ্নে ধরা পড়ল না ঠিক। হয়তো সেইজন্যেই, শীলাকেই এগিয়ে আসতে হলো আবার।

'পাঁচ বছর ধরে যার কাছে হেরে চলেছি, শেষ হারটাও তার কাছে হারলে কী থাকবে আমার!' শীলা একটু থামল। তারপর বলল, 'যাকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে এসেছিলে তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে

তুমিই বা কী পাবে!'

প্রশ্ন? না স্বীকারোক্তি? শীলার গলার স্বর শুনে তা বুঝবার উপায় নেই। ততক্ষণে ট্রেন চলতে শুরু করেছে। পুলককে সচেতন করার জন্যেই যেন শীলা বলল, 'দেরি কোরো না। উঠে পড়ো।'

পুলক উঠেই পড়ল। চলমান ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে, পিছনে তাকিয়ে যতদূর দেখা যায় দেখল, প্ল্যাটফর্ম জুড়ে একাই দাঁড়িয়ে আছে শীলা। গল্পে যেমন থাকে।

সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটা

ব্যতিক্রমটুকু চোখ এড়াল না নির্মলার। বাড়ি ফিরে জামা-কাপড় ছাড়েনি অলোকেশ, জুতোটা বাইরেই খুলে এসেছিল, তারপর যেমন-কে-তেমন শুয়ে পড়েছে বিছানায়। আজই নতুন বিছানো চাদরের ওপর প্রায় ধুলো পায়ে অলোকেশকে শুয়ে পড়তে দেখে সামান্য ক্ষুণ্ণ হলো সে। তবে, স্বামীকে অন্যরকম দেখেই বলল না কিছু।

এই ঘরটা রাস্তার দিকে। সারাক্ষণই গোলমাল কানে আসে। পর্দা টাঙানো থাকলেও জানলার ওপর দিকটা ফাঁকা, লরি বা কোনো উঁচু গাড়িটাড়ি গেলে চোখে পড়ে। ওপাশে, ফুটপাতের ওদিকে, একতলা বাড়িটার মাথায় দোতলা উঠছে নতুন। সকাল থেকে শেষ বিকেল অব্দি জনমজুর খাটে বলে প্রায়ই বন্ধ রাখতে হয় জানলাটা। প্রায় ছ'টা সওয়া ছ'টা পর্যন্ত। অলোকেশ বাড়ি ফেরার খানিক আগে নিরাপদ ভেবে খুলে দিয়েছিল। শোয়া, বসা, তাদের যা-কিছু সব এ ঘরে ; এমনকি আলমারিতে রাখা দিনে দিনে গড়ে তোলা গয়না, কাঁচা টাকা, সবই। অলোকেশ যখন থাকে না তখন একা বাড়িতে মাঝে মাঝেই এসব নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালো লাগে নির্মলার। মাঝে মাঝে মনে হয়, এসবই যথেষ্ট নয় ; আরো কিছু থাকলে ভালো হতো। জানলাটা খোলা থাকলে বাইরের লোকজনের সামনে শুধু নিজেকে বেআব্রুই লাগে না ; কেমন একটু ভয়ও হয়। দোতলা ওঠা শেষ হলে হয়তো সারাক্ষণই বন্ধ রাখতে হবে।

আজ এই নিয়ে অলোকেশের কাছে অনুযোগ করবে ভেবেছিল। হলো না।

এর আগেই অলোকেশকে হাত-মুখ ধুয়ে নেবার জন্যে তাড়া দিয়েছে নির্মলা। আবারও দিল।

'কী হলো !'

'কিছু না।' ঈষৎ নড়ে শুয়ে অলোকেশ বলল, 'যাচ্ছি'।

আরো খানিক পরে উঠল অলোকেশ। পোশাক ছাড়ার মধ্যে

পুরোপুরি অমনোযোগী, নড়াচড়ায় সঙ্গতি নেই। গেঞ্জিটা গা থেকে খুলে কলঘরে গেল।

অভিজ্ঞতা থেকে স্বার্থপর হতে শিখেছে নির্মলা। আর কাউকে না চিনুক, স্বামীকে চেনে। খুঁটিনাটি মিলিয়ে লক্ষ রাখে অলোকেশের ওপর। এখন কলঘরে জলের শব্দ এবং তার মধ্যে অলোকেশের কাশির শব্দ শুনে খটকা লাগল তার। দুঃখের মধ্যে কাশলে যেমন হয়, অনেকটা তেমনি ; শরীর খারাপ হলো নাকি? প্রশ্নটা উঠলেও অনুমানে বুঝতে পারল না নির্মলা। অলোকেশকে বিমর্ষ ও উদাসীন দেখালেও অসুস্থ মনে হয়নি।

এই সময়ের প্রবণতাবশত ড্রয়ার টেনে ধূপকাঠি বের করল নির্মলা। জেবলে কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর পটের সামনে রাখল।

অলোকেশ ফিরে এলো। বারান্দায় তক্তপোশে বসে ভিজে পায়ের পাতা তোয়ালে দিয়ে মুছল অনেকক্ষণ ধরে। অভ্যাসে নয়, নিশ্চিত অন্যমনস্কতার জন্যে। স্বামীর ভাবভঙ্গির কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না নির্মলার।

এ সময় হাসা উচিত তার। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আরো ক' মুহূর্ত অলোকেশকে লক্ষ করে ঠোঁট বিস্তৃত করল নির্মলা।

'কী হলো তোমার! জবুথবু বসে রইলে যে!'

'কিছু না— !'. অলোকেশ স্ত্রীকে দেখল, একই অন্যমনস্কতায়, 'চা হয়েছে?'

'হচ্ছে।'

'দাও।'

'এতক্ষণ শুয়ে বসে কাটালে, এখন তাড়া দিচ্ছ!' নির্মলা স্বভাবে ফিরে এলো, 'এত তাড়া কিসের!'

কিছুটা বিরক্তি দেখিয়ে নির্মলা চা আনতে গেলে অলোকেশ উঠে এলো ঘরে। ধুতিটা গুছিয়ে পরল, গেঞ্জি চাপাল গায়ে। আলনায় ঝুলিয়ে রাখা পাঞ্জাবিটা টেনে নেবার আগে যেটুকু অন্যমনস্কতা, তারই মধ্যে ফিরে এলো নির্মলা।

'ও কি! আবার বেরুচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ?'

সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিল না অলোকেশ। তার অন্যমনস্কতার মধ্যেই নির্মলার প্রশ্নটা অবাঞ্ছিত হয়ে ঝুলে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর চুল পরিপাটি করার পুরনো অভ্যাসে মাথার ওপর দ্রুত হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আশ্চর্য ! আমার কি ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই ? সব সময় জবাবদিহি করতে হবে কেন ? জানোই তো, সন্ধের পর অকাজে আমি কোনোদিনই বেরুই না। তবু এত প্রশ্ন কেন ?'

অলোকেশের এই হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠার কারণ কি তা বুঝতে পারছিল না নির্মলা। স্ত্রী হলেও পারস্পরিক সম্পর্কে সমানাধিকারের ব্যাপারটা প্রায়ই খোঁচা দেয় তাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে অলোকেশের কথাবার্তার আকস্মিকতা তাকে অসহায়ই করে রাখল।

চায়ের কাপটা তখনো নির্মলার হাতে। অভিমানে এবং কিছু না বলতে পারার অস্বস্তিতে কান গরম হয়ে উঠল তার। চায়ের কাপটা সাধারণত সে হাতেই তুলে দেয়। এখন দিল না। বরং বেশ শব্দ করেই ছোট টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, 'তোমার চা।'

অলোকেশ দেখল নির্মলার জেদ থেকে চা চলকে পড়েছে প্লেটে। এরপর সে কিছু বললে নির্মলা সুযোগ নেবে ভেবে চেপে গেল। কাপটা তুলে নিয়ে কোনাকুনি ভঙ্গিতে দাঁড়াল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। এবং ভাবল, যা-যা ভেবে সে বাড়িতে ফিরেছিল, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে মাথার মধ্যে।

মন আজ বিকেল থেকেই খারাপ হয়ে আছে। একটা অবশ-করা চিন্তা সারাক্ষণ আঘাত করে যাচ্ছে মাথায়। বাড়ি ফিরতে ফিরতেই ভেবেছিল খবরটা নির্মলাকে দেওয়া দরকার ; কিন্তু কীভাবে বলবে বুঝতে পারছিল না। একটা ঘটনা ঘটে গেছে, ঘটনার সঙ্গে সে কতটা জড়িত বুঝতে পারছে না ; অনেকবার ভাবল সে জড়িত না থাকলেও ঘটনাটা ঘটতই। তবে, এভাবে ভাবলেও অপরাধবোধটা যাচ্ছে না, এই যা। এই সময় নির্মলাকে ধমক না দিলেও পারত হয়তো। নির্মলা তার মনের অবস্থা না-বুঝে অন্য কিছু ভাবতে পারে—তার জেরে নতুন অশান্তি শুরু হবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দুঃখিত ভঙ্গিতে হাসল

অলোকেশ।

নির্মলা খুশি হলো কিনা বোঝা গেল না। ব্যস্ততার অছিলায় সামান্যক্ষণের জন্যে সরে গেল সামনে থেকে। ফিরে এলো আবার।

'টেবিলে দ্যাখো তোমার চিঠি আছে।'

'চিঠি ?' অলোকেশ এগিয়ে গেল, 'কার ?'

'জানি না। নিজেই দ্যাখো।'

তিনটি চিঠি। ছাপানো পোস্টকার্ডটা এসেছে তাদের স্টেশনার্সের দোকান থেকে, নববর্ষের আমন্ত্রণপত্র। দ্বিতীয়টা লাইফ ইনস্যুরেন্সের। অলোকেশ হাতে নিয়েও নিল না—নিশ্চয়ই রিমাইন্ডার, অন্তত কী থাকবে ওতে তা না-জানার কথা নয়।

পুরো চা খাওয়া হয়নি তবু কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল অলোকেশ। হঠাৎ তীব্র শীত গায়ে লাগার মতো একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

খাটের ওপর বসে পড়ল অলোকেশ। মুখ পরিশ্রান্ত, দৃষ্টি কাতর, মাথা বুকের দিকে ঝোঁকানো।

'কী দেখলে না চিঠিটা!'

স্বামীর কাছাকাছি এসে দাঁড়াল নির্মলা। অলোকেশের আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ বোধগম্য হলো না। ক'মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, এগিয়ে গিয়ে তৃতীয় চিঠিটার দিকে হাত বাড়াল। খামের ওপর লেখা ঠিকানায় চোখ বুলিয়ে এমনভাবে পরের কথাগুলো বলল যাতে মনে হবে সে আগেই ব্যাপারটা জানত।

'নির্ঘাত তোমার দিদির চিঠি!'

'কী লিখেছে ?'

অলোকেশের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র নির্মলা প্রায়ই খুলে পড়ে না। আজও পড়েনি। দুপুরের ডাকে আসা চিঠিগুলো সরিয়ে রেখেছিল যথারীতি। এখন খামের মুখ ছিঁড়ে ছোট ফর্দের মতো ভাঁজ-করা কাগজটা বের করে চোখ বুলিয়ে নিল দ্রুত।

'নাও! যা ভাবছিলাম, তাই। আবার টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে।'

চিঠিটা খামে ভরে খামসুদ্ধ হাতটা অলোকেশের দিকে বাড়িয়ে দিল নির্মলা। অলোকেশ চিঠিটা নিল। চিঠিতে নয়, ওর চোখ

নির্মলারই দিকে।

'টাকা!'

'হ্যাঁ। টাকা।'

অলোকেশ বাড়ি ফেরার আগেই বিকেলের স্নান ও প্রসাধন সেরে নিয়েছিল নির্মলা। মাজা পিঠের ওপর চুলের গোছা আলতোভাবে ঝোলানো। এখন দু'হাত তুলে সেটাকে খোঁপায় পরিণত করতে করতে বলল, 'টাকা ছাড়া কবে আর কী চেয়েছে?'

'মাসের গোড়ায় বরাদ্দের টাকা পাঠিয়েছি।' বিরক্ত গলায় বলল অলোকেশ, 'আমি দানছত্র খুলে বসিনি!'

'খুলেছ না খুলেছ, তা তুমিই জানো।' চতুর ভঙ্গিতে হাসল নির্মলা, নিঃশব্দে। অলোকেশকে অনিচ্ছুক দেখে বলল, 'আ-হা, ভাল করে খুলেই পড়ো না! যা দিচ্ছ তাতে সন্তুষ্ট নন বোধহয়। মেয়ের বিয়ের কথা ভাবছেন, সে-জন্যে তোমাকেও ভাবতে বলেছেন।'

'সেলফিশ!' নির্মলার শেষের কথাগুলোয় বিরক্ত হয়ে প্রায় দলা পাকানোর ভঙ্গিতে চিঠিটা মুড়ে টেবিলে ছুঁড়ে দিল অলোকেশ। উঠে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখল। সাতটা বাজে। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অলোকেশ উঠে দাঁড়াতে ওর চোখেমুখে, দাঁড়ানোর ধরনে ব্যস্ততা লক্ষ করল নির্মলা। নিশ্চিত কোথাও যাবার কথা ভাবছে এবং ভাবছে যখন তখন না গিয়ে পারবে না—এরপর সারা সন্ধেটা তাকে কাটাতে হবে একা—এসব ভাবতে ভাবতে বিরক্ত ও অখুশি নির্মলা হাত বাড়াল ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনের ছাপ মারা খামটার দিকে।

অলোকেশ আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল এবং ভাবল, দিদির চিঠির প্রসঙ্গটা এখনই না তুললে পারত নির্মলা। দোষ তার নিজেরও। নির্মলা বলল বলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে রিঅ্যাক্ট করতে হবে তার কি মানে আছে। বছর সাতেক আগে জামাইবাবু হঠাৎ মারা যাবার পর দিদির জন্যে যা ব্যবস্থা করার তা সে নিজেই করেছিল। নিজেই বলেছিল সে যতদিন আছে ততদিন অন্তত দিদির দুশ্চিন্তাবোধ করার কোনো কারণ নেই। দিদি তাকে সবই জানাতে পারে অসংকোচে। নির্মলা এসব জানে না।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভুলে সে নিজে এতটা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ল কেন?

নির্মলার চোখ তখনো চিঠিতে। বারান্দা থেকে ঘরে এলো অলোকেশ।

'জিতেনের আসবার কথা সাতটার আগে। এখনো এলো না!'

'কোথায় যাবে?' টাকরায় শব্দ তুলে নির্মলা বলল, আড্ডা?'

'নাঃ।' নিজেকে গুছিয়ে নিল অলোকেশ, 'বিশুর বাড়ি। বিশু—'

'প্রিমিয়ামটা এখনো জমা দেয়নি দেখছি।' চিঠিটা ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রাখল নির্মলা, 'কী সব বন্ধুবান্ধব! চিট্। আমি বলছি, টাকা ও আর জমা দেবে না। এই নিয়ে ক'বার হলো! দিদি না হয় আত্মীয়—'

'বিশু নিশ্চয়ই অসুবিধেয় পড়েছিল, না হলে—' জোর দিয়ে বলবার চেষ্টা করল অলোকেশ, 'কেউ কোনোদিন ওকে অসৎ বলতে পারেনি। বেচারা—! টাকা মেরে দেবার মতন লোক ও নয়।'

'সাফাই গেয়ো না! চাকরিটা গিয়েছিলো কী জন্যে? টাকা লোপাট করেনি?'

'ওটা কন্সপিরেসি। ছা-পোষা পেয়ে জড়ানো হয়েছে ওকে। এখনও এনকোয়ারি চলছে—'

'হ্যাঁ। চলছে! অনন্তকাল ধরে চলবে! ততদিন ওর সংসার টানবে তোমরা!' একটু থেমে, অলোকেশ তখনো চুপচাপ দেখে, ঝাঁঝালো গলায় বলল নির্মলা, 'কে কেমন তা জানতে আমার বাকি নেই। কোনো কোনো মানুষের গায়ে গণ্ডারের চামড়া থাকে—লজ্জা, অপমানের ভয় তাদের থাকে না। সেদিন দেখলে তো, ওর বউয়ের দেমাকটা। বলে কিনা গয়না বেচে শোধ করে দেবে! ক'টা গয়না আছে ওর?'

প্রশ্নের ধরনে নির্মলা কথাটা শেষ করার আগেই অস্বস্তিতে খাটের ওপর বসে পড়ল অলোকেশ। ওকে দেখতে দেখতে নির্মলা বলল, 'তিনশ আশি টাকা করে তিনবার। আগের দুটো প্রিমিয়ামের ইনস্টলমেন্ট তোমাকেই দিতে হলো আবার! আমি খুব অবাক হচ্ছি,

সেদিন অত স্পষ্ট করে বলবার পরও— । অন্য কেউ হলে অপমানে আত্মহত্যা করত ।

'নিমু !'

স্ত্রীকে ধমক দিল অলোকেশ । কিন্তু জোর পেল না তেমন । শেষ পর্যন্ত বলল, 'বাড়ি বয়ে গিয়ে সেদিন তো অনেক অপমান ওকে আমরা করেছি । আর কেন ?'

'অপমানে তো আর টাকাটা ফিরে আসবে না । টাকা খোলামকুচি নয় । তোমার না লাগতে পারে, আমার গায়ে লাগে ।'

'আর লাগবে না ।'

দরজায় যেন বেল পড়ল । মোটরের হর্নের শব্দে এবং আশ-পাশের অন্যান্য কোলাহলে শব্দটা উঠেই চাপা পড়ে গেল । সেই মুহূর্তের কথা থেমে-যাওয়া নৈঃশব্দ্যের মধ্যে উৎকর্ণ হলো অলোকেশ । নির্মলাও । জিতেনের আসবার কথা সাতটায় । এখন প্রায় সাড়ে সাতটা । এখান থেকে জিতেনের সঙ্গে বিশ্বনাথের বাড়ি যাবার কথা । কারণ জানে না, তবু অলোকেশ বুঝতে পারছিল না যা ঘটেছে তারপর কী করে সে বিশ্বনাথের স্ত্রী সুধার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ।

দরজায় আবার বেল পড়ার আগে স্ত্রীর দিকে তাকাল অলোকেশ ।

'শোনো, নির্মলা ।' নিজেকে যতটা সম্ভব ধাতস্থ করে নিয়ে অলোকেশ বলল, 'বিশ্বনাথ কাল রাত্রে সুইসাইড করেছে—'

'কি !'

'হ্যাঁ—'

'কেন !'

নির্মলার মুখ নীরক্ত । ভয় পাওয়ার ধরনে ক্রমশ বিছানায় গিয়ে বসল ।

'আমি গণৎকার নই । কেন তা বলতে পারব না ।'

অলোকেশ দরজা খুলতে গেল । জিতেনকে ভিতরে ঢুকতে দিয়ে বলল, 'আমি রেডি হয়ে আছি । তোমার দেরি কেন ?'

'বলছি । ভিতরে চলো ।' নিঃশ্বাস নিয়ে জিতেন বলল, নির্মলা আছে ?'

'হ্যাঁ।'

দরজা বন্ধ করে জিতেনের মুখোমুখি দাঁড়াল অলোকেশ।

'কী ব্যাপার! তোমাকে খুব আপসেট লাগছে?'

'বলছি।'

ওরা ঘরের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। জিতেনকে দেখে চেয়ার এগিয়ে দিল নির্মলা।

'বসব না।' জিতেনের গলা স্পষ্ট। কয়েক মুহূর্ত অলোকেশ এবং নির্মলাকে দেখে নিয়ে বলল, 'ওরা শ্মশান-ফেরত আমার বাসায় এসেছিল। আর যাওয়ার দরকার নেই।'

অলোকেশ ওর কথার অর্থ ধরতে পারল না।

পকেট হাতড়ে একটা কাগজের মোড়ক বের করে টেবিলের ওপর রাখল জিতেন।

'সুধা এই চুড়িটা তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

অলোকেশ বলল, 'তার মানে!'

'মানে আমি বলব কী করে!' চোয়াল দৃঢ় হলো জিতেনের। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সুধার ভাই শ্মশানে এনেছিল, দিল—'

জিতেন কথা শেষ করল না।

অলোকেশ ঠোঁট কামড়ে ধরল।

দুজনকে দেখতে দেখতে ঘড়ির দিকে চোখ পড়ে গেল নির্মলার। সাড়ে সাতটা। এবং ভাবল, এ নিয়ে আর উচ্চ্যবাচ্য না করাই ভালো। সময়ে সবই ঠিক হয়ে যাবে। প্রিমিয়ামের টাকা বিশ্বনাথই নিয়ে গিয়েছিল, জমা দেয়নি। বার বার এরকম করায় দু'চারটে কথা তারা বলেছিল ঠিকই, কিন্তু ওকে আত্মহত্যা করার প্ররোচনা দেয়নি। চুড়িটাও সুধা পাঠিয়েছে নিজের গরজে। এ সবের পরেও কী অদ্ভুতভাবে অপরাধী হয়ে যাচ্ছে তারা! কেন! পৃথিবীটা হা-ভাতেদের কব্জাতেই চলে যাচ্ছে নাকি।

লোকসভা-বিধানসভা

লেকের জলে এক ডুব দিয়ে উঠে মাথা ঝাড়তে ঝাড়তে পরী দেখল অল্প দূরে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে তার চান করা দেখছে এক বাবু। প্যান্ট-শার্ট পরা, লম্বাও নয় বেঁটেও নয়, মাথাভর্তি চুল, গায়ের রং তারই মতো ময়লা, কিন্তু কেমন ছোকরা-ছোকরা চেহারা। চোখাচোখি হতে মুখ ফিরিয়ে নিল। দূর থেকে মাথায় গাঁটরি নিয়ে এগিয়ে আসছে একটা মেয়েমানুষ, তার পিছনে একটা সাইকেল। কিছুই জানে না এমন ভঙ্গি করে এখন এসবই দেখছে।

আর একটা ডুব দেবার আগে লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখল পরী এবং ভাবল, তাকেই দেখছিল এটা সে বুঝল কী করে। আশপাশে রেল-লাইনের ওপারের বস্তি থেকে আসা আরো তিন-চারজন মেয়েমানুষ। তবে ওদের কেউই তার মতো জোয়ান নয়। খানিকটা তফাতে গামছা পরে গায়ে জল থাবড়াচ্ছে একটা রিকশাওলা। আরো দূরে মাটি শুঁকতে শুঁকতে ঘোরাফেরা করছে দু-তিনটে ছাগল ; মুখে কী যেন কামড়ে ধরে একটা নেড়ি হেঁটে গেল ছাগলগুলোর পাশ দিয়ে। সে যখন চান করতে নামে তখন লোকটা ছিল বলে মনে পড়ছে না। তারপর হঠাৎই—। এই ভোটের দিনে, যখন চারদিক শুনশান, মেয়ে-মদ্দরা কখনো জোড়ে, কখনো দল বেঁধে ছুটছে ইস্কুলবাড়িতে ভোটের লাইন দিতে, তখন কাজকম্মো ফেলে এই লোকটা নিশ্চয়ই ওই বুড়ি মেয়েমানুষগুলোকে, রিকশাওলাকে কি ছাগলগুলোকে দেখতে লেকের পাড়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েনি! যৈবন আলাদা জিনিস।

ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে চলে গেল সাইকেলের লোকটা। পিছনে পিছনে মাথায় শুকনো ডালপালার গাঁটরি নিয়ে মেয়েমানুষটাও। লোকটা আবার মুখ ফিরিয়ে এদিকে। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতে সিগারেটে টান দিয়ে জল দেখতে লাগল।

পরী দাঁড়িয়েই থাকল। কোমরজলে নেমে একটা বড় ডুব দেবার

পর সাপটানো শাড়ির তলায় জলে ভিজে বিজবিজ করছে বুক। পাড়ে রাখা আছে আর একটা শাড়ি আর বেলাউজ। এই কাপড়ের জল নিংড়ে, গা মুছে, শুকনো জামাকাপড় পরে ঝুপড়িতে ফিরবে সে। ভিজে শাড়িটা শুকোলে মা আসবে চান করতে। যা গরম! মনে হয় মেয়েছেলে না হলে গা উদোম করে ঘুরে বেড়াতে পারত।

আজকের দিনটা খারাপ। সকালে দুটো পাঁউরুটি আর গোটা-তিনেক আধপচা পেয়ারা ভাগাভাগি করে খেয়েছে পাঁচজনে; একপ্রস্ত ভাঁড়ের চা খেয়েছে সে আর তার মা, শকুন্তলা। দেখতে দেখতে বেলা গাড়িয়ে গেল। সকাল থেকে চল্লিশ পয়সার বেশি ভিক্ষে না জোটায় গুলেকে কাঁখে তুলে বাজারে তরকারি কুড়োতে গেছে মা। যাবার আগে লেকে চান করতে পাঠাল তাকে। বলল বিষ্টুদার দোকান ঘুরে যেতে। এসব ধান্দা দিব্যি বোঝে পরী, শকুন্তলা তাকে রোজগারে পাঠাল। ফেরার আগে দু-পাঁচ টাকা হাতে পেয়ে গেলে ভালো হতো, অন্তত চালটা ডালটা কেনা যেত তাতে। কিন্তু এই শুনশানের বাজারে দেবে কে টাকাটা?

লোকটাকে কি অস্থির লাগছে একটু? তা না হলে যে-সিগারেটটা ফুঁকছিল সেটা জলে ছুঁড়ে দিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে পকেট থেকে প্যাকেট বের করে আর একটা ধরালো কেন? কী মনে করে বসে পড়ল বেঞ্চিতে!

ফেলে দেওয়া সিগারেটের টুকরোটা এদিক-ওদিক ভাসতে ভাসতে এখন এগিয়ে আসছে তারই দিকে। সেটাকে আর লোকটাকে লক্ষ করতে করতে আর ডুব দিল না পরী। দু'হাতে জল সরিয়ে জায়গা-মতো সরে এসে হাওয়া লাগতে দিল বুকে। দেখতে চাইলে দেখুক। মনে হচ্ছে ঠিকই ভেবেছে। মতলব না থাকলে কেউ এদিকে এসে এভাবে তীর্থের কাকের মতো বসে থাকে! অন্যদিন এ সময় এদিকটা এমন চুপচাপ থাকে না। চান করতে নামে আরো বেশি পুরুষ, মেয়েমানুষ। উল্টোদিকের পাড়ে কাপড় কাচে ধোপারা। এদিক-ওদিক করে ছুটকো-ছাটকা লোকজন, সাইকেল। আর গাছের ছায়ায় বসে ঢলাঢলি জুমাচুমা করবার জন্যে বগলদাবা করে ছুকরি নিয়ে আসে দু'একটা ছোঁড়া। আজ একেবারে শুনশান। বিষ্টুদা বলেছিল বলেই

জানে আজ মে মাসের কুড়ি তারিখ, সোমবার। সকাল থেকে আকাশ মেঘলা, একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে গুঁড়িগুঁড়ি। সেজন্যে নয়। সব ভোটের জন্যে। ও বাবু, তোমার ভোট নাই নাকি গো! প্যাঁট-প্যাঁট করে দেখছ কি!

পেটের ভিতর খিদে পাবার জায়গাটা খলবল করে উঠল রঙ্গ-তামাশায়। সামান্য হাসিতে কেঁপে উঠল ঠোঁটদুটো। ভিক্ষে করতে করতে একসময় হাত পাতলেই বুঝতে পারত কোন মানুষটা ভিক্ষে দেবে, কে দেবে না। নিজেকে মেয়েমানুষ হিসেবে চিনতে পারার পর থেকে শিকারও চিনতে শুরু করেছে পরী। মুখচোখ, হাবভাব, হাঁটাচলার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারে কোন পুরুষটার মতলব কি। কখনো এ-পাড়ায় কখনো ও-পাড়ায়, ফুটপাথে আর ঝুপড়িতে থাকতে থাকতে আস্তে আস্তে শিখে গেছে সব। ইজের-পরা বয়স থেকে ফ্রক-পরা বয়সে পৌঁছনো পর্যন্ত এ-ফুটপাথ থেকে ও ফুটপাথে দৌড়াদৌড়ি করে ট্রাফিকে দাঁড়ানো গাড়ির বাবুদের কাছে হাত পেতে ঘ্যানঘেনে গলায় দিব্যি ভিক্ষে চাইত সে। শাড়ি ধরার পর শকুন্তলা আর তাকে করতে দেয় না ওসব। তার বদলে এখন সে কর্পোরেশনের ছাইগাদায় গিয়ে ময়লা কাগজ, টিনের কৌটো, শিশি-বোতল আর পাঁশ কুড়োয়। বস্তা বোঝাই করে সেসব বিক্রি করে আসে বিষ্টুদার রদ্দির দোকানে। এখন গাড়ি ধরে ভিক্ষে চায় বোন সুন্দরী। দাদা আঁটুল মোটর গ্যারাজে কাজ পাবার পরেও কিছুদিন আসত, তারপর একদিন টাকা-পয়সা নিয়ে মা'র সঙ্গে চিল্লাচিল্লি হলো খুব। আঁটুল মাকে 'খানকি' বলল, শুনে ছাই ঘাঁটার লোহা হাতে তেড়ে গেল মা, 'ও রে খানকির বাচচা—আয়, আজ খুন করব তোকে—', বলল এই সব। সেই থেকে আঁটুল নাপাত্তা। আর দু' ভাই বাঁটুল শাঁটুল এখনো ছোট; যখন যেমন পায় ভিক্ষে করে, খবরের কাগজ কুড়োয়, রাস্তার দেওয়াল থেকে পোস্টার ছিঁড়ে জড়ো করার জন্যে তক্কে তক্কে থাকে। ভালোমন্দ খাবার ইচ্ছে হলে বাজারের হোটেলের সামনে কাঁদুনি গেয়ে ঝোলটা আলুটা মাছের কাঁটাটা নিয়ে আসে অ্যালুমিনিয়ামের পুরনো বাটিতে। দেড় দু'-বছর আগে ফুটপাথে শুয়েই পাংচার সারানো গাড়ির চাকায় হাওয়া ফোলার মতো আবার পেট ফুলতে শুরু করল মা'র, দেখতে

দেখতে বেরিয়ে এলো গুলে। মানুষের বাচ্চা তো নয়, যেন ওল্টানো আরশোলা। আকাশ-চাওয়া হয়ে কখনো হাসে, কখনো কাঁদে।

পরী জানে না তার বাপ কে, কেই-বা জন্ম দিল সুন্দরী, বাঁটুল, শাঁটুলকে। আগে বুঝতো না, এখন বোঝে ফুটপাথে গাদাগাদি করে শুয়ে এমনি এমনিই পেট ফোলে না মা'র। গুলের জন্মের আগে কিছুদিন রিকশাওলা গঙ্গারামের সঙ্গে খুব মাখামাখি হয়েছিল শকুন্তলার ; নীল পাড়ের কোরা শাড়ি পেয়ে এমন ভাব দেখাত যেন গর্বে পা পড়ে না মাটিতে। সিঁদুরও পরত কিছুদিন। গঙ্গারাম একদিন তাদের রিকশায় চড়িয়ে ঘোরাল এক চক্কর। ফুটপাথ থেকে তাকেও ফ্রক কিনে দিয়েছিল একটা। লোকটাকে খারাপ লাগত না। গুলের জন্মের পরেও বেশ আদিখ্যেতা ছিল মা'র সঙ্গে। তো একদিন রাতে গঙ্গারাম তার ওপর চড়াও হবার পর সে চিল্লাচিল্লি শুরু করতে ঘুম ভেঙে ব্যাপারটা টের পেয়ে শকুন্তলাও গেল ক্ষেপে। গঙ্গারামকে তাড়াল, তাকেও শাড়ি ধরাল। হা রে বুদ্ধি ! শাড়ি ধরালেই বুঝি রক্ষে পায় ফুটপাথের মেয়েমানুষ ! তার পেট নেই ? হোক ছেঁড়া, গা-গতর ঢাকবার জন্যে মাঝেমধ্যে শাড়ি বেলাউজের দরকার নেই ? আর শুধু গঙ্গারামেরই বুঝি দোষ ! ওই যে একদিন ফুটপাথ সাফাইয়ের নামে হল্লা গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল তাদের— শকুন্তলাকে ছাড়লেও তাকে ছাড়ল না সহজে, সেও কি এমনি-এমনি নাকি ! তারপর এই যে সেদিন বিষ্টুদার দোকানে দশ টাকা ধার চাইতে গিয়েছিল শকুন্তলা, বিষ্টুদা নাকি বলল, এখন যা, দুপুরে পরীকে পাঠাস—তো তাকেই পাঠাল শকুন্তলা, আর তাকে দোকানের আলমারির পিছনে নিয়ে গিয়ে আদর করল বিষ্টুদা, জুমাচুমা করল, তারপর লোক আসায় হাতে দশ টাকা গুঁজে দিয়ে বিদেয় করে দিল, এসব কি এমনি এমনি নাকি ! ছিয়া যা, ছিয়া যা। পরী জানে, সেও শকুন্তলার মতো খানকি হয়ে যাচ্ছে। শকুন্তলাও জানে, না হলে বিষ্টুদার দোকান ঘুরে চান করতে যেতে বলবে কেন ! তা বিষ্টুদাও থাকলে তো ! গিয়ে দেখল দোকানের ঝাঁপ ফেলা। আশপাশেও কানা।

চটপট একটা ডুব দিয়ে পরী ভাবল, আর চান করে কাজ নেই।

লোকটা গরম থাকতে থাকতেই একটা কিছু করে ফেলা দরকার। কেটে গেলেই ফক্কা। মনে হচ্ছে এ বাবুটারও ভোট নেই তাদের মতো, কিন্তু খিদে আছে শরীরে।

এতক্ষণ মজা পাচ্ছিল, জল ঠেলে পাড়ের দিকে এগোতে এগোতে শরীরে রাগ টের পেল পরী। ভোটের জন্যেই নাকি আজ সব ছুটি। আর এমনই ছুটি যে দোকানপাট সব বন্ধ, রাস্তায় বাস-মিনিবাস নেই বললেই হয়, ট্রাম চলছে অনেকক্ষণ পরে পরে। তাও ফাঁকাফক্কা। আর রাস্তায় মোটর আর ট্যাক্সি এতই কম যে হুসহাস করে বেরিয়ে যাচ্ছে সব। জ্যাম হচ্ছে না কোথাও। সকাল থেকে গাড়ি ধরার জন্যে অনেকবার ছুটোছুটি করেছে সুন্দরী—একবার তো চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল, কিন্তু একটাও গাড়ি দাঁড়ায়নি। দশটা নয়া পয়সা পর্যন্ত ভিক্ষে দেয়নি কেউ। দিন তিন-চার হলো বাঁটুল শাঁটুলেরও পোস্টার ছেঁড়া বন্ধ। ক'দিন আগে সিনেমার পোস্টার ছিঁড়তে ছিঁড়তে একটা ভোটের পোস্টারও ছিঁড়ে ফেলেছিল বাঁটুল, সঙ্গে সঙ্গে হইচই কাণ্ড, তিন-চারজন দৌড়ে এসে চড়চাপড় মারল বাঁটুলকে। সেই থেকে ভয়ে ভয়ে আর কোনো পোস্টারেই হাত দেয়নি ওরা। কাজকাম নেই, এখন ফুটপাথে ইটের টুকরো ছুঁড়ে ছুঁড়ে কংগ্রেস-বিজেপি-ছি পি এম-গঙ্গারাম-লোকসভা-বিধানসভা খেলে। তবে আজ বিকেল পাঁচটায় ভোট শেষ হয়ে যাবার পর আর কেউই পোস্টার, ঝোলানো কাগজের লম্বা দাঁড়ি নিয়ে মাথা ঘামাবে না। ক'দিন খুব চিল্লাচিল্লি করেছে সব, মিছিল করেছে, মিটিং করেছে, ভোট ফিরি করেছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে। রাতের দিকে বোমা-টোমাও ফাটিয়েছে দু'-একটা। আজ সব ক্লান্ত, হাল-বেহাল, গা-ছাড়া হয়ে থাকবে। তখনই সুযোগ। বিষ্টুদা বলেছে আগে থেকেই ভোটের কাগজ কুড়নোর জন্যে তৈরি থাকতে, ইস্কুলবাড়িতে ভোটের গেট বন্ধ হলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে। বলেছে, 'আশপাশের রাস্তায় যত যা আছে কুড়িয়ে বস্তা বোঝাই করবি। কাল নিয়ে আসবি এখানে, ওজন করে দাম দিয়ে দেবো। লোকসভা-বিধানসভা মিলিয়ে এবার তো এলাহি কাণ্ড রে! ভোটে তোদেরই বরাত খুলে গেল দেখছি!'

বিষ্টুদা বললেও পরী জানে কাজটা সহজ হবে না। আশপাশে

তাদের মতো খানকির বাচ্চা কম নেই। আছে পাড়া, বে-পাড়া! ধান্দাটা সকলেই জানে। এই তো গেলবছর—নাকি তার আগের বছর? ভোটের শেষে একটা কাগজ ঝোলানো ইয়া লম্বা দড়ির দখলদারি নিয়ে বে-পাড়ার কয়েকটা কাগজ-কুড়ুনের সঙ্গে তাদের দলের রক্তারক্তি লেগে গিয়েছিল আর কি! তাছাড়াও আছে খচড়া। পোস্টারে এমন এঁটেল লেই মারে আজকাল যে ছিঁড়তে গেলে দেওয়াল ছাড়ে না, ছিঁড়ে যায়। ছেঁড়া কাগজের দামও কমে যায়। এত সব খচড়া সামলে, কতটা কী বস্তায় উঠবে শেষ পর্যন্ত তা কে জানে!

পরী একটা নিঃশ্বাস চাপল। ঝটপট গা মুছে ভিজে শাড়ি ছেড়ে গায়ে জড়াল শুকনোটা, বেলাউজটাও। না, লোকটা নড়েনি। আড়ে তাকিয়ে দেখল, আবডালে চোখ রেখেছে তার ওপর। মুখ ফিরিয়ে নিল। লোকটা একা নয়। দেখছে ওই রিকশাওলাটাও। শালা আর একটা গঙ্গারাম যেন। এতক্ষণ জলের থাবড়া মারছিল গায়ে, এইবার জলে নামল।

ভিজে শাড়িটা নিংড়োতে নিংড়োতে খর চোখে বেঞ্চিতে বসে থাকা লোকটাকে দেখল পরী। তারপর আশেপাশে কে আছে না আছে দেখে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'ও বাবু গো, একা কেন! ভোট নাই নাকি?'

লোকটা ঘাবড়ে গেল কেমন। হাতে সিগারেট ছিল তখনো, সেটা ফুঁকবে না ফেলে দেবে ভাবতে ভাবতে বলল, 'কী চাই?'

পরী হাসল। তার আবার লজ্জা কিসের! আরো একটু এগিয়ে এসে বলল, 'চলো, ওদিকে গাছের তলায় বসবে। দশ টাকা দিও।'

'যাও, ভাগো এখান থেকে—।' লোকটা ক্ষেপে গেল এবার, 'বদমাইশি করতে হলে অন্য জায়গায় যাও—'

'ভাগব কেন! এটা তোমার জায়গা নাকি!'

'ওহ্! যত্ত সব—!'

লোকটা উঠে দাঁড়াতে এবং তারপর জায়গা ছেড়ে হাঁটা দিতে মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল পরী। বোধহয় লোক চিনতে ভুল করেছিল সে। বোধহয় এমনিই এসে বসেছিল লোকটা, চোখ, আছে

বলে তাকিয়ে ছিল, ওই করতে গিয়ে তার চান করাও দেখেছে। কিন্তু এই লোকটা কেটে গেলে শূন্য হাতে ফিরতে হবে তাকে। বিষ্টুরও ঝাঁপ বন্ধ, বিকেলের আগে খুলবে মনে হয় না। আদৌ খুলবে কিনা কে জানে!

পরী মরিয়া হয়ে উঠল। লোকটা চলে যাচ্ছে, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকেই দেখল দূরে একটা লোক এগিয়ে আসছে এদিকে। হয়তো আর কেউও এসে যাবে এর মধ্যে। তখনই ফন্দি এঁটে দৌড়ে গিয়ে পিছন থেকে লোকটার হাত টেনে ধরল সে।

লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। থমকানো ভাব, কথা ফুটল না মুখে।

হাতটা ছেড়ে দিল পরী।

'ঠিক আছে, পাঁচ টাকা দিয়ে যাও। মায়ের দিব্যি, সারাদিন খাওয়া হয়নি, বাবু—'

'ফাজলামি!' লোকটা আবার এগিয়ে গেল, এক পয়সাও দেবো না।'

'না দিলে চিল্লাব।' আবার লোকটার গায়ে গায়ে এঁটে এলো পরী, যেভাবে আগে ভিক্ষে চাইতে মোটরগাড়ির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটত। বলল, 'ওই দ্যাখো, লোক আসছে। বলব খারাপ লোক, গায়ে হাত দিয়েছিল—'

লোকটা আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ ফ্যাকাসে। খুব ভয় পেয়ে গেছে যেন। তারপর হঠাৎই মুখ ঝুঁকিয়ে বুক পকেট হাতড়ে একটা দু' টাকার নোট বের করে ছুঁড়ে দিল ওর মুখের ওপর। তারপরেই হাঁটতে শুরু করল হনহন করে।

টাকাটা খামচে ধরে পরী ভাবল আবারও পিছু ধরে। তারপর ভাবল, থাক। তবু ভয় পেয়ে দু' টাকা দিল। বাবুটা তো সত্যিই খারাপ কিছু করেনি। দেখল, দূর থেকে আরো দূরে যেতে যেতে লোকটা পিছন ফিরে তাকাল একবার। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল অন্য রাস্তার বাঁকে।

পরী ফিরতে লাগল। দু' টাকায় আর কিছু না হোক, মুড়ি খেয়ে কাটানো যাবে দুপুরটা। শকুন্তলাও হয়তো কিছু জোগাড়

করে আনবে এর মধ্যে। ভোট কি আর রোজই হচ্ছে! আর ভোট না হলেইবা কী! খানকির বাচ্চারা যেন মানুষের বাচ্চার মতো রোজই দু' বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে!

এসব ভেবে মেঘলা আকাশের দিকে তাকাল পরী। কাঁধের ওপর জল নিংড়ানো শাড়ি, হাতের মুঠোয় টাকা। সামান্য জ্বালা করে উঠলো চোখদুটো।

অন্তরা

দূরে কোথাও একটা শিশু কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদছে অনেকক্ষণ ধরে। অদ্ভুত ভারসাম্যে ভরা সেই স্বর, এমনই নিখুঁত যে মাঝে মাঝে থামলেও তার রেশ থেকে যাচ্ছে আশপাশে—আবার শুরু হবার পর মাঝখানের স্তব্ধতাটাকে চেনা যাচ্ছে না আলাদা করে। কে কাঁদছে, কার শিশু, কেনই বা! ধারে কাছে কেউই কি নেই যে ভুলিয়ে-ভালিয়ে শান্ত করতে পারে ওকে, বন্ধ করতে পারে ওই অসহায় কান্না!

সকালে নিজের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ওই শব্দ কানে আসায় কিছুক্ষণ থেকেই অস্বস্তি হচ্ছিল অন্তরার। এখন নতুন করে শুরু হওয়ায় স্পষ্টই অধৈর্য বোধ করল। রঞ্জি ট্রফিতে বাংলা বনাম তামিলনাড়ুর খেলার রিপোর্টে চোখ বোলানো সেরে স্কোরের অংশে এসে এগোতে পারল না আর। কী হয়েছে, কেন এই কান্না, তার আন্দাজ পাওয়ার জন্যে ওঠার আগে অভ্যাসবশত চায়ের কাপটা হাতে তুলে খেয়াল হলো শেষ চুমুকটা খানিক আগেই দিয়েছিল সে। তখন, প্রায়ই যেমন মনে হয় তার, মনে হলো, আজকের দিনটা হয়তো ভালো যাবে না

প্রায় চিৎকারে পরিণত হতে হতে কান্নাটা থেমে গেছে ততক্ষণে রেশ যদিও কাটেনি। দরজা খুলে দক্ষিণের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কিছুটা বিক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকাল অন্তরা; তারপর সামনে। উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে ছড়িয়ে দিল দৃষ্টি।

ভোরের ধোঁয়াশা কাটিয়ে রোদ এখন বেশ ঝলমলে। প্রায় থেমে থাকা হাওয়ায় শীত নেই তেমন। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে লেক দেখা যাচ্ছে, জলেরও কিয়দংশ। পাশের এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে চাকায় বিশ্রি শব্দ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে একটা লরি। অনেকগুলো নতুন বাড়ি উঠছে এদিকে—সম্ভবত তারই কোনোটার জন্যে মাল রেখে গেল। দৃষ্টি নামালেই বস্তি, একটার পর একটা ঝুপড়ি মাথা

তুলেছে রেললাইন বরাবর। ওখানে প্রায় সারাক্ষণই একটা না-একটা হুল্লোড়, চেঁচামেচি লেগে থাকে বলে দিনের বেলায় অন্তত ব্যালকনির দরজাটা বন্ধ রাখতে হয়। ফ্ল্যাটটা ছ'তলায় বলেই বাঁচোয়া, ওপরে উঠতে উঠতে ভেবড়ে যায় শব্দগুলো। আরো নীচে হলে শুধু এই দরজাটা কেন, বস্তির শব্দ ও আরো নানারকম শব্দ এড়াতে হয়তো সব দরজা, জানলাই বন্ধ রাখতে হতো।

বছর দুয়েক আগে কৌশিকের বাবা মারা যাবার পর যখন বিডন স্ট্রিটের কাকাদের সঙ্গে ভাগের বাড়ী বিক্রি করে তিন বেডরুমের এই বড়সড় ফ্ল্যাট কিনে দক্ষিণ কলকাতায় চলে এলো ওরা, তখন লেকের ধারে খোলামেলা পরিবেশে ফ্ল্যাট পাচ্ছে, এটাই ছিল স্বস্তি। বস্তির কথা কারও মাথায় আসেনি। ইদানীং আরো একটা অসুবিধার কথা মনে হচ্ছে অন্তরার। ওখান থেকে পাইকপাড়ায় তার বাপের বাড়িটা কাছে ছিল, মন খারাপ হলে কি তেমন-তেমন ইচ্ছে হলে যখন-তখন ঘুরে আসতে পারত। কৌশিক বাইরে খেলতে গেলে তো কথাই নেই, মা'র কাছে যাওয়াটা বাঁধা ছিল তখন। অবশ্য এ বাড়িও তখন ফাঁকা ছিল না এখনকার মতো। গত দু' বছরে শুধু বাড়ি ছেড়ে ফ্ল্যাটেই উঠে আসা হয়নি, ঘটেছে আরো ঘটনা। ননদ সুমিত্রার বিয়ে হবার পর সে চলে গেছে দিল্লিতে; দেওর শৌভিক ভর্তি হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। আর—

সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অন্তরা। তখনই বাচ্চার কান্নাটা কানে এলো আবার। সেই একই ধরন, কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদা। যেন তুলতুলে গায়ে হঠাৎই জোরে পিন ফুটিয়ে দিয়েছে কেউ। আ-হা! মনে হচ্ছে কাছেই কোনো ঘর থেকে উঠে আসছে শব্দটা। একটু আগে শোনার মধ্যে যে-দূরত্ব ছিল এখন আর সেটুকুও নেই। বস্তির কোনো ঘরেই কি!

সচকিত হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু দেখতে না পেয়ে, কোমর ভেঙে ব্যালকনির রেলিং থেকে ঝুঁকে ডানদিকে তাকাতেই বিস্ময়ে থমকে গেল অন্তরা। এতক্ষণের মায়ায় ঢুকে পড়ল বিরক্তি ও রাগ। দেখল, সামনের রাস্তা যেখানে ঘুরে গেছে বস্তির দিকে, সেখানেই, ঝুপড়িগুলোর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এক বেলুন,

বাঁশির ফেরিওলা। তাকে ঘিরে ক্রমশ ভিড় করছে কাচাকুচোরা। মুখে কী একটা বাজনার ফুঁ দিয়ে শিশুর কান্নার শব্দ করে যাচ্ছে আধবুড়ো লোকটা।

দৃশ্যটা ক্ষুব্ধ করে তুলল অন্তরাকে। একটি শিশুর ক্রমাগত হাত-পা ছাড়া কান্নায় অস্থির হয়ে ক্রমশ একটা অসহায়তা বোধের ভিতর ঢুকে পড়েছিল সে—একবারও ভাবেনি ব্যাপারটা কিছুই নয়, বস্তুত মেকি, বোধ আর অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে যাবে এতটাই তফাত।

এসব ভাবনা সামান্য খাপছাড়া করে দিল তাকে। পরের পর মুহূর্তে চলে গেলেও যেন অন্য কোনো ভাবনায় ঠিকঠাক দাঁড় করাতে পারছে না নিজেকে। এগোতে পারছে না।

শব্দটা থেমে ছিল কয়েক মুহূর্ত। আবার শুরু হলো।।

কিন্তু এখন আর বিভ্রান্ত হবার কিছু নেই। যেখানে ছিল সেখান থেকে সরে এসে ওভার ব্রিজের ওপর দিয়ে এদিকে ওদিকে দিন শুরু হবার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করতে করতে সে আবার ফিরে গেল খবরের কাগজের খেলার পাতায় এবং ভাবল, আর একটু পরেই মাদ্রাজের চিপক মাঠে ম্যাচ বাঁচানোর লড়াইয়ে নামবে বাংলা। সরাসরি জয়ের গন্ধ পাওয়া তামিলনাড়ুর এগারোজনের বিরুদ্ধে ইনিংস পরাজয় এড়ানোর খেলায় যুঝতে ব্যাট হাতে যে দু'জন এগিয়ে যাবে ক্রিজের দিকে, তাদের একজনের নাম কৌশিক। তার স্বামী। পারবে কি ?

কাল যখন দুশো একুশ রান পিছনে থেকে প্রথম ইনিংস শেষ করল বাংলা এবং ফলো-অনে বাধ্য হলো, ফাইভ ডাউন ব্যাটসম্যান কৌশিক দত্ত তখন সাতচল্লিশ নট আউট, দলের মধ্যে সর্বোচ্চ। কোনোরকমে একটা বাউন্ডারী হাঁকানোর সুযোগ পেলেই পেরিয়ে যেত পঞ্চাশ। পায়নি। এবারের মতো টিম অবশ্যই ছিটকে যাচ্ছে। আজ, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সামনের বছরে কী হবে তা ভাবা যায় না।

গত বছর রঞ্জির দুটো খেলায় চান্স পেয়েও তেমন কিছু করতে পারেনি কৌশিক। এবারেও সুযোগ পায়নি অসম, ওড়িশা আর

বিহারের বিরুদ্ধে ম্যাচগুলোয়। ক্ষোভ ও হতাশায় ধরে নিয়েছিল কেরিয়ার গেল—নিজেই দেখছে এক দু'বার দল থেকে বাদ পড়ায় রপ্ত হতে হতে কতজন আর সুযোগই পায় না ফেরার। নতুন কেউ হঠাৎ পারফরমেন্স দেখিয়ে ঢুকে পড়ে দলে। তার ওপর কৌশিক ব্যাট কিংবা বল কোনোটাতেই স্পেশালিস্ট নয়, ওপরের পাঁচজন আউট হবার পর তাকে নামতে হয় ফাইভ কি সিক্স ডাউনে। মিডিয়াম পেসার এবং স্পেশালিস্ট স্পিনাররা ক্ষয়ে যাবার পর ক্যাপ্টেনের ইচ্ছে হলে তাকে ডাকা হয় লেগস্পিন করাতে। লেগে গেলে ভালো, না হলে কয়েক ওভারের পরই গিয়ে দাঁড়াও থার্ডম্যান কিংবা মিড-উইকেট বাউন্ডারিতে। অলরাউন্ডার? হয়তো, হয়তো নয়—বাদ পড়েছে জেনে ফেলার ভয়ঙ্কর মুহূর্তে খবরের কাগজের উটকো বিশেষণ কাজে লাগে না।

কৌশিকেরও লাগেনি। এবার আরো খারাপ হলো যখন রঞ্জি ট্রফিতে বাংলা দলের সম্ভাবনা নিয়ে লিখতে গিয়ে খবর-কাগজের এক ফিচার-রাইটার দল নির্বাচনে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে পুরনো কাসন্দি ঘাঁটার মতো বাজে সিলেকশনের দৃষ্টান্ত হিসেবে গতবারের টিমে নির্বাচিত দুজনকে কচুকাটা করল। তাদের একজন কৌশিক। এবং লিখল, চার-পাঁচ বছর আগে যাকে ভাবা গিয়েছিল টেস্ট ম্যাচ ট্যালেন্ট, ন্যাশনাল টিমে আসবেই, চার বছরে ছ'টা ম্যাচে দশটা ইনিংসে তার মোট রান বিরাশি, একটা হাফ-সেঞ্চুরিও নেই। উইকেটের সংখ্যা তিন, ইত্যাদি। লিখল, আসলে 'বিগ ম্যাচ টেম্পারামেন্টের অভাব।' এবার ক্লাব ক্রিকেটে তার রানের ধারাবাহিকতা ভালোই ছিল, উইকেটও পাচ্ছিল। এই অবস্থায় যখন ধরে নিয়েছে দলে ঢুকছেই, তখন ওই লেখাটাই যেন ডুবিয়ে দিল তাকে। ষোল জনেও এলো না।

দলে না ঢোকার হতাশাই শুধু নয়, ওই লেখাটা তখন যেন তাড়া করছিল কৌশিককে। ট্যালেন্ট থাকা সত্ত্বেও সুযোগ না পাওয়াটাকে আশপাশের যারা এতদিন ব্যাড লাক বলে ধরে নিত, সহানুভূতি জানাতো, বিগ ম্যাচ টেম্পারামেন্টের অভাব কথাগুলোকে আঁকড়ে ধরল তারা। সহানুভূতির জায়গায় এসে গেল অবজ্ঞা। খেলার

জোরেই ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়েছিল কৌশিক, খেয়ালখুশি মতো চলতে পারত সেই সুবাদে, খাতিরও পেত। হঠাৎ সেখানেও যেন বদলে গেল সব।

বেলা আটটার ঈষদুষ্ণ রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে এসব ভাবতে ভাবতে ক্রমশ এক তন্ময়তার মধ্যে ঢুকে পড়ল অন্তরা। এখন সে এক ভেঙে-পড়া কৌশিককেই দেখছে।

কৌশিককে, নাকি নিজেকেও? হতে পারে; সে এখনো নিশ্চিত নয়। বলতে কি, সেদিন সন্ধেয় যা ঘটল, তারপর থেকে যতই চেপে-চুপে থাক, সে নিজেকে নিয়েও ভাবছে।

বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে যতদিন ছিল ততদিন একান্নবর্তী পরিবারে বহুজনের পরিবেশে সময় কাটানো সমস্যা ছিল না। আর কোনোভাবে না হোক, ইচ্ছে হলেই চলে যেতে পারত বাপের বাড়ি। তা ছাড়াও ছিল নতুন বিয়ের আমেজ। প্রায় কাছাকাছি বয়সের ননদ সুমিত্রাকেও পাওয়া যেত সঙ্গী হিসেবে। সেজন্যে, বিয়ের আগে সে ভেবেছিল এম-এ পাশ করেছে, চাকরি করবে, তখনকার মতো অন্তত চাপা দিতে পেরেছিল ইচ্ছেটা। কিন্তু, দু'বছরের মধ্যে এমন ওলটপালট হয়ে গেল সব যে নিজের মধ্যে হঠাৎই অসহিষ্ণু বোধ করতে শুরু করেছিল অন্তরা। সুমিত্রা নেই, শৌভিক থাকে হস্টেলে—মাঝেমধ্যে এলেও সে চলে নিজের মতো। এমন নিঃসঙ্গ অবস্থায় কৌশিক বেরিয়ে গেলে বাড়িতে সঙ্গী বলতে মাত্র একজনই—কৌশিকের মা কনক। এমনিতে নিরীহ হলেও মহিলা এমনই চুপচাপ আর নিজের মনে থাকেন যে তাঁকে নিয়ে চলে না।

বস্তুত, বিয়ের তিন বছরের মধ্যেই অন্তরা ক্রমশ অনুভব করছিল ভবিষ্যতের যে-সম্ভাবনার কথা ভেবে কৌশিককে বিয়ে করেছিল সে, সেগুলো এখন আর দেখা যাচ্ছে না ঠিকঠাক। তার বদলে এসে গেছে এমন কতগুলো সম্ভাবনা, যেগুলোর কথা আগে ভাবেনি। ভাবলে হয়তো তড়িঘড়ি বিয়ে না করে অপেক্ষা করত, যে-কোনো একটা চাকরিতে ঢুকে গুছিয়ে নিত নিজেকে। তখন এমনও হতে পারত সে কৌশিককে বিয়েই করল না, তার বদলে আর কাউকে। সত্যি বলতে, কলেজ-ইউনিভার্সিটির বন্ধু নন্দার দাদা অভিরূপ তো সেই সুযোগ

দিয়েইছিল তাকে। যদি সেরকম ঘটত, তাহলে এই যে সংলাপহীন নিঃশব্দ জীবন, যার বেশিটাই কাটছে একা-একা ভাবনায়, এই জীবনটাও কি বদলে যেত না!

আজ বলে নয়, কিছুদিন ধরেই এসব ভাবছে অন্তরা। আশপাশ বন্ধ এই জীবন থেকে যেমন করেই হোক বেরুতে হবে তাকে। তা না হলে, নিজেই বুঝতে পারছিল, সমস্ত ক্ষোভ জমা হচ্ছে এই বিয়েটারই ওপর। তার চেয়েও বেশি নিজের ওপর। সে জানে না কতদিন এইভাবে মেনে চলবে নিজেকে, নিজের কাছে নিজেই অসহনীয় হয়ে উঠবে ক্রমশ। নিজেকে নিয়ে যথেচ্ছ সময় কাটানোর একটা উপলক্ষ জুটে গেলে হয়তো সহজ বোধ করতে পারত।

কৌশিক ক্রিকেট ছাড়া বড় একটা কিছু বোঝে না। যেন জীবনটাকে ও বিচার করে রান আর উইকেটের সংখ্যা দিয়ে। নিজের বোঝার বাইরেও যে একটা আপোস করার জায়গা থাকে, সেটা বুঝতে চায় না সহজে—এতদিন একসঙ্গে শোয়াবসা করতে করতে স্বামীর চরিত্রের এই দিকটা বুঝে নিয়েছে অন্তরা। সে সময় খুঁজছিল।

এভাবে ভালো লাগছে না, চাকরির খোঁজ করবে—একদিন কথাগুলো বলায় এমন অবিশ্বাসের চোখে তার দিকে তাকাল কৌশিক, যেন বল উইকেট ছুঁয়ে গেলেও বেল পড়েনি।

'হঠাৎ চাকরি করার কথা ভাবছ কেন!' একটু চুপ করে থেকে বলল কৌশিক, 'এরকম তো কথা ছিল না!'

'এসব ভাবনা কি আগে থেকে তৈরি থাকে!' অন্তরা বলল, 'প্রয়োজনই তৈরি করে।'

'তোমার আবার কিসের প্রয়োজন? টাকার?'

শুধু প্রশ্নই নয়, প্রশ্নের সঙ্গে তাচ্ছিল্য মিশেছিল কৌশিকের গলায়।

অন্তরা বলল, 'চাকরি করলে টাকা পাওয়া যায়। তখন টাকাটাকেও মনে হয় প্রয়োজন। কিন্তু, শুধু টাকা রোজগারের জন্যেই সকলে চাকরি করে না।'

'অন্য কারণও থাকে নাকি!'

'তাহলে বলব কেন!'

হিন্দু—৯

'সেটা বলা যায় না ?'

কৌশিক যে এখনো বুঝবে না, অন্তত অনুমান করতে পারবে না, তা ভাবতে পারেনি অন্তরা। ইদানীং প্রায়ই যেমন হয়, দুজনের মাঝখানের দূরত্বটা চিনতে পারল সে।

কৌশিক বলল, 'থেমে গেলে কেন! শুরুটা তো ভালোই করেছিলে!'

এও সেই খেলার ভাষা। বলার ধরনে ক্ষুব্ধ হলেও নিজেকে সামলে নিল অন্তরা। এখন তার সামনে দুটো উপায়। কিছু না বলে সরে যাওয়া, কিংবা এতদিন যা বলতে পারেনি মুখ ফুটে, ছটফট করেছে বলবার জন্যে, সেটা পরিষ্কার করে বলা। সে বলেই ফেলল।

'আমার ভালো লাগছে না, কৌশিক। একদম ভালো লাগছে না।'

'তার মানে!'

'বোরিং লাগছে। কিছু করার নেই, সারাদিন কারও সঙ্গে কথা বলার নেই—এটাই কি একজনের জীবন হতে পারে! মাঝে মাঝে মনে হয় সকালেই স্লিপিং পিল খেয়ে আরো আট ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিই!'

'আশ্চর্য তো!'

'কেন!'

ছোট্ট একটু হাসি কেঁপে গেল কৌশিকের ঠোঁটে। খুশিতে নয়। বলল, 'নিজেকে হঠাৎ আলাদা করে ভাবছ কেন! চারপাশে বহু মেয়েই তো বিয়ে করেছে, তাদের মধ্যে ক'জন চাকরি করে। হার্ডলি—'

কৌশিক থেমে গেল।

আগে ততটা মনে হয়নি, কিন্তু বিয়ের পর থেকে ক্রমশ লক্ষ করেছে অন্তরা, যেভাবে কথা বলে কৌশিক, যে-ভাষায়, তার চেয়ে একটু অন্য-ভাবে বলতে গিয়ে থেমে যায় প্রায়ই। সাধ্যে কুলোয় না, কিংবা, এমনও হতে পারে, নিজের সম্পর্কে হঠাৎ সচেতনতা এসে থামিয়ে দেয় ওকে। আত্মবিশ্বাসের অভাব ? হবেও বা। এখনো যেমন ওই 'হার্ডলি' কথাটায় এসে আটকে গেল, অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। কী বলতে চেয়েছিল তা অবশ্য বোঝা যায়।

কৌশিক কতটা উত্তেজিত তা বোঝবার জন্যে ক'মুহূর্ত সময় নিয়ে

অন্তরা বলল, 'আমাকে কি শুধু আরো একটা মেয়ে হিসেবে দেখছ!'

'তা নয়।' দায়সারা গলায় বলল কৌশিক, 'ব্যাপারটা তো একই!'

'যাদের কথা বলছ, তাদের হয়তো প্রয়োজন নেই। সংসার, ছেলেমেয়ে—। যোগ্যতার ব্যাপারটাও এসে যায়।'

'যেখানে আছ, সেটাও একটা সংসার। আর—।' থেমে গিয়ে কথা খুঁজল কৌশিক। পরে বলল, 'আসলে নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে তুমি এত প্রাউড যে সেটা আমাকে না শুনিয়ে পারো না।'

কোন কথা থেকে কোন কথায় এসে পড়ল, অন্তরা ভাবল, এখন চুপ করে থাকাই হয়তো উচিত হবে। ব্যাপারটা যে তার মনের, নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির চেষ্টা, কৌশিক একবারও তা ভাবল না।

'বেশ তো।' কৌশিক হঠাৎ বলল, 'তোমার যা ইচ্ছে হয় করো। কিন্তু পরে যেন আমাকে দায়ী করো না।'

পরোক্ষ কিছুর আভাস দিয়ে কৌশিক সেখানে থেমে গেলেও অন্তরা বুঝতে পারছিল কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে; কেন কৌশিক আর আগের মতো নেই। বড় ক্রিকেটার হবার সম্ভাবনা থেকে একটার পর একটা ব্যর্থতায় ক্রমশ নিজের মধ্যে ঢুকে পড়ছে ও—তার চাকরি করার ইচ্ছেটাকেও স্বাভাবিক বলে ভাবতে পারছে না। তা না হলে এমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে কেন!

আমিও কি আর আগের অবস্থায় আছি? পরে ভেবেছিল অন্তরা, এই যে প্রায় কিছু না ভেবে, মাত্র কিছুদিনের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার পরেই বাড়ির লোকজনের দ্বিধা সত্ত্বেও সে বিয়ে করে ফেলেছিল কৌশিককে, তার মধ্যেও কি ভালো লাগা, ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু ছিল না? কৌশিককে ঘিরে কোনো উচ্চাশা? নিশ্চয়ই ছিল, তা না হলে হঠাৎ-হঠাৎ কেন মনে হয়, কৌশিককে বিয়ে না করলে তার নিজের জীবনটা অন্যরকম হতে পারত! কখনো মনে হয়, সম্ভাবনা না দেখিয়ে কৌশিক যদি হতো নিতান্তই সাধারণ একজন, আর সে বিয়ে করত ওকে, তাহলে হয়তো সম্পর্কের ভিতরের এই টানাপোড়েনগুলো মাথা চাড়া দিত না।

কিছুদিন আগে, কাগজে টিম নির্বাচন নিয়ে ওই ফিচারটা বেরুনোর পর যেমন হলো। বিকেলে ছোট বোন মাধুরী ফোন করল

হঠাৎ।

'দিদি, কৌশিকদার কী হয়েছে রে ?'

অন্তরা ভাবতে পারেনি প্রশ্নটা এইভাবেই আসবে। সামলে নিয়ে বলল, 'কেন !'

'কাগজে কীসব লিখেছে আজেবাজে। সবাই বলছিল।'

অন্তরা চুপ করে থাকল।

মাধুরী বলল, 'এবার তো ভালোই খেলছে। চান্স পাবে না টিমে ?'

'আমি কী করে জানব !'

'তা অবশ্য ঠিক।' পরের কথাগুলো বলবার আগে মাধুরী বলল, এখনো তো টিম হয়নি, কৌশিকদাকে বল না একটু ধরাকরা করতে। মনে হচ্ছে 'ওই জার্নালিস্টটা অন্য কারও হয়ে টাকা খেয়ে লিখেছে—কৌশিকদা আর হিমাদ্রি রায়ের জায়গায় যাতে আর কেউ ঢোকে। তুই বল না বুঝিয়ে !'

গম্ভীর গলায় অন্তরা বলেছিল, 'বলব।'

সেদিনও সন্ধেয় বিমর্ষ কৌশিক বাড়ি ফেরার পর বলবে কি বলবে না ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত কথাটা বলেছিল অন্তরা।

'বুঝতে পারছি, আমাকে নিয়ে অনেকেরই অসুবিধে হচ্ছে।' থেমে থেমে বলল কৌশিক, 'মাধুকে বলো, ধরাকরা করে টিমে ঢুকলেও খেলাটা হবে মাঠে। তখন আবারও আমি ফেল করতে পারি। কাগজ তো ভুল লেখেনি—ওটাই আমার পারফরমেন্স রেকর্ড।

ওই কণ্ঠস্বরই যেন অন্তরাকে মনে পড়িয়ে দিল সে কৌশিকের স্ত্রী ; স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব থাকে। গলায় এসে গেল সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গি।

'কিন্তু এবার তো তুমি ভালো খেলেছ—এর মধ্যেই তিনটে সেঞ্চুরি পেয়েছ। ব্যাড প্যাচ সকলেরই যায়। সুনীল গাভাসকারের যায়নি !'

'তার আগে ও নিজের ক্লাস চিনিয়েছিল। ব্যাড প্যাচ দিয়েই শুরু করেনি।'

কৌশিকের চোখ অন্যমনস্ক, হঠাৎ দেখলে মনে হবে আর কাউকে নয়, নিজেকেই দেখছে। শূন্যতা ছাড়া সেখানে কিছুই নেই। একটু

পরে বলল, 'ভাবছি খেলা ছেড়ে দেবো।'

লেখাটা কোথায় বিঁধেছে, কীভাবে তাড়া করে বেড়াচ্ছে কৌশিককে, ওর হালছাড়া কথাবার্তা শুনেই তা অনুমান করেছিল অন্তরা। সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে, কথা বলছে, যে তার স্বামী—এটা বোঝবার আগে নিজেও কেমন অসহায় বোধ করে সে। হঠাৎ মনে হয়, এই যে সে কখনো কখনো ভাবে কৌশিক সাধারণ হলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কটা সহজ হতে পারত আরো, সেটা সত্য নয়। কোনো কারণে সেটা সত্য হতে থাকলে সেও ব্যর্থ হয়ে যাবে। খেলা ছেড়ে দেবে! তাহলে যে থাকবে—কোনোরকমে গ্র্যাজুয়েট হওয়া একজন, ব্যাঙ্কে চাকরি করতে যাবে, বাড়ি ফিরবে ইত্যাদি, তাহলে কোন পরিচয়ে নিজেকে চেনাবে অন্তরা! এই যে ফোন করল মাধুরী, কথাগুলো বলল, তা কৌশিক বিশেষ বলেই তো! না হয় নিন্দাই করেছে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ক'জনকে নিয়েই আর লিখছে খবরের কাগজ!

'পাগলামি করো না কৌশিক।' এই মুহূর্তের ভাবনার সবটুকু প্রকাশ করতে না পেরেও অন্যরকম গলায় অন্তরা বলল, 'খবরের কাগজে কী না কী লিখেছে, তাতেই এত আপসেট হচ্ছ কেন! এখনো তো টিম অ্যানাউন্স করেনি!'

ভর সন্ধেয় কী হয়েছে কৌশিকের, স্ত্রী কী বলছে তা খেয়াল না করে বিছানার ধার ঘেঁষে বসে নেলকাটার দিয়ে পায়ের নখ কাটতে শুরু করল। মাঝারি চেহারায় পেটা স্বাস্থ্য সত্ত্বেও এখন ওর বসার ধরনে শোকের ছবি। ঠোঁটে হাসি ফুটতে গিয়েও ফুটছে না। সময় নিয়ে বলল, 'আজ অফিসে ম্যানেজার ডেকেছিল। বলল সামনে ফিউচার পড়ে আছে—শুধু খেলা নিয়ে পড়ে না থেকে ব্যাঙ্কের কাজে মন দিলে তাড়াতাড়ি প্রোমোশন হবে।'

কৌশিকের প্রতিক্রিয়ার কারণগুলো এতক্ষণে স্পষ্ট হলো। মাধুরীর মন্তব্য শুনে নয়, মন খারাপটা অফিস থেকেই সঙ্গে নিয়ে এসেছে ও। মন খারাপ থেকেই পৌঁছে গেছে নিজের প্রতি অবিশ্বাসে।

আর কী বলতে পারে ভাবছিল অন্তরা। তার আগেই কৌশিক বলল, 'লোকটা কোনোদিন মাঠে যায়নি, জীবনে ক্রিকেটের ব্যাট হাতে

ধরেনি। কিন্তু খবরের কাগজ পড়ে।'

'এ সবের জবাব দেওয়ার দায়িত্বও তো তোমার।' এভাবে শুরু করে অন্য কথায় চলে গেল অন্তরা, 'আমার মন বলছে এবার তুমি চান্স পাবেই—'

তার নিজের সমস্যা এবং কৌশিকের সমস্যা নিয়ে তাদের পারস্পরিক কথাবার্তার সঙ্গে বাস্তবের যে তেমন কোনো সম্পর্ক নেই, পরের ঘটনাগুলোই তা বলে দিল। মুখে যতই বলুক খেলা ছেড়ে দেবে, গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পরের দিন আবার প্র্যাকটিসে গেল কৌশিক। আর কৌশিক অখুশি হবে জেনেও, নিজের বদ্ধ অবস্থাটা কাটাবার জন্যে আড়ালে চাকরির চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল অন্তরা। নিজেই ভাবল, চাকরি করার ইচ্ছে আর সত্যি-সত্যিই চাকরি পাওয়ার মধ্যে তফাত আছে। হাতে একটা কিছু এসে গেলে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে কৌশিকের সঙ্গে কথা বললে সে কি আর একগুঁয়ে থাকতে পারবে!

সকালের ঈষদুষ্ণ ছায়া-মেশানো রোদ্দুরে একা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো মনে পড়া নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অন্তরা ভাবল, যে যেমনই ভাবুক, বাস্তবের টানাপোড়েনের আড়ালেও কিছু একটা ঘটে বোধহয় কোথাও—হয়তো বা ভাগ্যেরই জোরে, তা না হলে এবারেও টিম থেকে বাদ পড়ে যাওয়া কৌশিক কী করে এখন ইনিংস হার বাঁচানোর খেলা খেলছে মাদ্রাজে? আর, প্রায় দু'বছর পরে কেনই বা হঠাৎ রাসবিহারীর মোড়ে তার দেখা হয়ে যাবে পুরনো বন্ধু নন্দার সঙ্গে, রাস্তা থেকে তাকে বাড়িতে টেনে নিয়ে যাবে নন্দা, সেখানে অভিরূপও থাকবে, তারপর অভিরূপই গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দেবে তাকে এবং গাড়িতে ওর পাশে বসে যেতে যেতে অন্তরার মনে হবে, এই যে সে যাচ্ছে অভিরূপের পাশে বসে, ক্রিকেটার কৌশিক দত্তের বউ হবার মোহে পড়ে হঠাৎ একটা অঘটন ঘটিয়ে না ফেললে এই যাওয়াটাই স্বাভাবিক হতে পারত তার জীবনে। এসব ভেবেই নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে তার।

এরকম সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ থাকে না ; বরং মনে পড়ার ভারে তীব্র হয়ে ওঠে নিজের ওপর অভিমান। সে বিশেষ কথা বলেনি,

সুতরাং অভিরূপও বলেনি। তবে বাড়ির কাছাকাছি এসে বাকি রাস্তাটুকু হেঁটেই যাবে বলে অন্তরা যখন গাড়ি থেকে নেমে যেতে চাইল তখন বাড়তি কিছু না বলে পকেট থেকে নিজের ভিজিটিং কার্ড বের করে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে অভিরূপ শুধু বলেছিল, 'যদি কখনো ইচ্ছে করে—এতে আমার অফিসের ফোন নাম্বার আছে—'

'আমি করব না।' কার্ডটা না দেখেই ব্যাগে ভরে নিতে নিতে, দূরে দূরে ছড়ানো আলোর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অন্তরা বলেছিল, 'বেকার লোকের ভিজিটিং কার্ড থাকে না। তবে আমারও একটা নাম্বার আছে, যদি মনে থাকে কাল না হয় অফিস থেকেই ফোন করবেন—'

তার পরের ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে সেদিন সন্ধের ঘটনা পুরনো মনে হয়। কিছুটা অবিশ্বাস্যও লাগে। সত্যি বলতে, অন্তরা এখনো বুঝতে পারে না এতদিনের অদর্শন ও একদার সম্পর্কে স্তব্ধতা এসে যাবার পরেও কী করে সে ফোন করার কথা বলতে পেরেছিল অভিরূপকে! যেন হঠাৎই একটা ঘোরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল—কৌশিককে জড়িয়ে তার যে অস্তিত্ব, সেটার কথা মনে পড়েনি একবারও। সমগ্র চেতনা জুড়ে সারাক্ষণ থেমে থেমে বেজে যাচ্ছিল এক নিঃশব্দ স্পর্শ—টেলিফোনের শব্দ; আচ্ছন্নতা কাটে পরের দিন কৌশিক অফিসে বেরুনোর কিছুক্ষণ পরে, যখন সত্যি-সত্যিই বেজে উঠল টেলিফোন। অনিশ্চিত হাতে রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলবার পর যার গলা ভেসে এলো সে অভিরূপই। অন্তরা তখন কাঁপছে।

মনে পড়ার ঘোরে প্রায় সেদিনের সেই মুহূর্তের অনুভবেই পেঁছে গিয়েছিল অন্তরা। হাওয়ায় ঠাণ্ডা না থাকলেও একটা চোরা শীত যেন ছড়িয়ে পড়ছিল সর্বাঙ্গে। সাড় পেল শৌভিকের গলায়।

'বৌদি, তুমি এখানে!' দরজা থেকে ব্যালকনিতে চলে এলো শৌভিক, 'ডেকে সাড়া পেলাম না!'

জবাব দেবার আগে একটু সময় নিল অন্তরা। নিঃশ্বাস সহজ করে নিয়ে বলল, 'যা শব্দ চারদিকে!'

ভুল বলেনি। অন্তরা দেখল, শিশুর কান্নার মৌক শব্দটা চোখ টেনে নিয়েছে শৌভিকেরও। একটু আগে সে যেমন ঝুঁকে তাকিয়েছিল ঝুপড়ির দিকের রাস্তায়, ব্যালকনির রেলিং ধরে শৌভিকও ঝুঁকে দেখছে

সেইভাবে। তবে, মনে হচ্ছে, শব্দটা এখন সরে গেছে দূরে।

শৌভিক মাথা তুলতে অন্তরা বলল, 'অবিকল বাচচার কান্না, না? হঠাৎ শুনে আমিও বেরিয়ে এসেছিলাম ঘর থেকে। ঠকে গেলাম।'

শৌভিক জবাব দিল না। কোণাকুনি ডানদিকে একটা বাড়ি উঠছে, সেখানে বাঁশের ভারা বেয়ে একটা মজুর উঠে যাচ্ছে ওপরে ওর চোখ সেইদিকে।

'ঘুম ভাঙল কখন?'

'এই তো—'

'সকালে ডাকব ভেবেছিলাম। দেখলাম বেঘোরে ঘুমোচ্ছ।' পুরোপুরি বাস্তবে ফিরে তৎপর হলো অন্তরা, 'চা করা আছে, এনে দিচ্ছি। মা কি পুজো থেকে বেরিয়েছেন?'

'নাঃ।' এই সকালেই কব্জিতে ঘড়ি পরে নিয়েছে শৌভিক, সময় দেখে বলল, 'ন'টা তো বাজেনি এখনো।'

কিছু প্রশ্ন আছে যা অভ্যাসেই করা হয়। তা না হলে সময়ের মোটামুটি আন্দাজ থেকেই অন্তরা বুঝে নিতে পারত পুজো সেরে বেরুতে এখনো দেরি আছে কনকের। তিনি বেরুলে আরো একবার চায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ততোক্ষণে ঠিকে কাজের মেয়ে পুষ্পও এসে যাবে, শব্দহীন ফ্ল্যাটের ভিতরেও সঞ্চার হবে কিছু শব্দের।

দিন কাটানোর এই ধারাবাহিকতায় বৈচিত্র্য বলে কিছু নেই, যা আছে—কৌশিক বিশ্বাস করুক না করুক—তার নাম ক্লান্তি। মুহূর্তগুলো যত এগোয় সময়ের ভার ততই বেশি করে চেপে বসে বুকে। তফাত এইটুকু, কৌশিকের আড়ালে, কনক ও শৌভিকের আড়ালে ইদানীং সে খুঁজে নিয়েছে নিঃশ্বাস নেবার জায়গা। সে জানে, একটু পরে যখন শৌভিক থাকবে না ধারে কাছে, কনকও দূরে, তখন আস্তে আস্তে টেলিফোনটার দিকে এগিয়ে যাবে সে। পাঁচদিনের খেলার আজ চতুর্থ দিন; কৌশিক ফিরতে ফিরতে আরো দু'তিনদিন। যবেই ফিরুক, তার আগে টেলিফোন করবে কৌশিক। সে না ফেরা পর্যন্ত অন্তরা যথেচ্ছ হতে পারে।

আপাতত শৌভিকের জন্যে চা ঢেলে সে নিজেও নিল আধ কাপ। ঘরে এসে দেখল খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে শৌভিক সেই

পাতাটাই দেখছে, যেখান থেকে চোখ তুলে একটু আগে সে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল—বোধ আর অভিজ্ঞতার মধ্যে কত তফাত তা বুঝতে পেরে ক্ষুব্ধ হয়ে ক্রমশ ঢুকে পড়েছিল স্মৃতিতে। তার একদিকে কৌশিক, অন্যদিকে অভিরূপ থাকলেও বস্তুত সে খুঁজছিল নিজেকেই, নিজের অবস্থানটা চিনতে পারছিল না ঠিকঠাক। শৌভিক এসে না ডাকলে হয়তো আরো কিছুক্ষণ ওইভাবেই কাটাত।

এখনই মনে পড়ল, খেলার খবর জানবার আগ্রহে কাল রাতের ইংরিজি নিউজ বুলেটিন শুনতে সে আর শৌভিক দুজনেই বসেছিল টিভি-র সামনে। ব্যাটিং ধস্ নামায় বাংলা ফলো-অন করেছে, এটুকু ছাড়া খবরে আর কিছুই বলেনি। শৌভিক বিকেলেই এসেছে খড়্গপুর থেকে, দু'তিনদিন থাকবে, খবর শুনে হতাশ গলায় বলল, 'দাদার লাকটাই খারাপ। সেই চান্স পেল, কিন্তু সেমি-ফাইনালের আগে নয়, তাও অমন টাফ টিমের বিরুদ্ধে। এখন তো ফলো-অন করল!'

'পুরো টিমই নিশ্চয়ই বাজে খেলেছে।' অন্তরা বলল, 'তোমার দাদা একা কী করবে!'

'তা ঠিক। কিন্তু—।' ব্যাপারটা পুরোপুরি মানতে পারছিল না শৌভিক, বলল, তামিলনাড়ুর ইনিংসে একটা উইকেট পেয়েছে। স্লিপ আর গালি ফিল্ডাররা ক্যাচ না ফেললে আরো দুটো পেতে পারত। সে-খবর কেউ রাখবে না। এখন ব্যাটিংয়েরও যদি কিছু না পারে—!'

উদ্বেগ আড়াল করতে পারেনি শৌভিক। কখনো মুখ ফুটে না বললেও অন্তরা বুঝতে পারে দাদাকে নিয়ে ও কতটা চিন্তিত। যেভাবে কৌশিকের উইকেট পাওয়া না-পাওয়ার খুঁটিনাটি বর্ণনা করল তা থেকেই বোঝা যায় খুঁটিয়ে পড়েছে গতকালের খবরের কাগজ। খেলা চলছে মাদ্রাজে, চিপক-এ ; কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স-এ খেলা হলে রেডিওতে রিলে করত হয়তো, তখন কী হলো না হলো জানবার জন্যে পরের দিনের খবরের কাগজের অপেক্ষা করতে হতো না। আর সঙ্গে সঙ্গে না জানার অর্থই তো দুশ্চিন্তা বাড়ানো। মনে হচ্ছে কৌশিক একাই খেলছে না, তার ছায়ায় খেলছে শৌভিক এবং আরো

কেউ কেউ, অন্তরা নিজেও। আশায় উঠছে, ব্যর্থ হলে নেমে যাচ্ছে হতাশায়।

ইদানীং এমনই হয়েছে, ছোটখাটো কথার সূত্রেই ভাবনায় এসে যায় স্তব্ধতা। এগোতে পারে না, সেই সুযোগে ঢুকে পড়ে স্মৃতি। শৌভিকের কথার সূত্রেই অন্তরার মনে পড়ল, ওই যে মাধুরী একদিন ফোন করে কৌশিক সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলেছিল, সেসবও কি উদ্বেগ বা লজ্জা থেকে নয়! মাধুর বন্ধুরা তো জানে সে কৌশিক দত্তের শ্যালিকা! তাদের কাছে মুখ দেখাতে পারছে না হয়তো। তা ছাড়া মেয়েটা নিজেও ক্রিকেট পাগল।

মনে আছে, বিয়ের পরের দিন কী কথায় যেন মাধুরী বলে ফেলেছিল, 'জানেন কৌশিকদা, আমারও খুব ইচ্ছে একজন ক্রিকেটারকে বিয়ে করা। দিদিটা পাজি, আগেই করে ফেলল!' গায়ে তখনো বিয়ের গন্ধ লেগেছিল বলেই সম্ভবত ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারেনি কৌশিক। 'সামনেই তো একজন আছে—', বলেছিল, 'তোমার দিদির আপত্তি না থাকলে তাকেও বিয়ে করতে পারো।' পার্ট-ওয়ানে পড়া সপ্রতিভ মেয়ে মাধুরী, কৌশিকের কথায় লজ্জা পেলেও সামলে নিতে দেরি করেনি। বলেছিল, 'এখন একজনই থাক। টেস্ট-এ নেমে সেঞ্চুরি করুন—তখন না হয় দুটো বউয়ের কথা ভাববেন।'

ঠাট্টাই; কিন্তু আশাও কি ছিল না মাধুরীর সেদিনের কথায়! কৌশিককে নিয়ে গর্ব, ওর সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশ্বাস?

কোথায় কী! সে-বছরই রঞ্জি ট্রফির প্রথম ম্যাচ, বিহারের বিরুদ্ধে। ব্যাট করতে নেমে সুব্রত ব্যানার্জির প্রথম বলটাকেই স্কোয়ার কাট করে বাউন্ডারিতে পাঠাল কৌশিক। তাই দেখে লাফিয়ে উঠেছিল তার দুপাশে বসা শৌভিক আর মাধুরী। ওদের উচ্ছ্বাস লক্ষ করে শৌভিকের পাশে বসে থাকা মাঝবয়েসী ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কৌশিক দত্ত তোমার কেউ হয় নাকি?' শৌভিক বলেই ফেলল, 'আমার দাদা।' ভদ্রলোক বললেন, 'শট্ দেখেই বোঝা যায় খুব ট্যালেন্টেড্—।' ভদ্রলোকের কথা শুনে নিজেকে সামলাতে পারেনি মাধুরী, মুখ বাড়িয়ে বলল, 'আমার জামাইবাবু—।'

লজ্জায় হাত টেনে ধরে বোনকে বসিয়ে দিয়েছিল অন্তরা। পরের

বল করার জন্যে সুব্রত তখন দৌড়তে শুরু করেছে। ইয়র্কার, ঠিক সময়ে কোনোরকমে ব্যাট নামিয়ে সামাল দিল কৌশিক। তার পরেই ওদের ফিল্ডিংয়ের রদবদল করতে দেখে নন-স্ট্রাইকার ব্যাটস্‌ম্যান স্নেহাশিস মজুমদার এগিয়ে এসে কিছু বলল কৌশিককে। পাকা খেলোয়াড়, কৌশিকেরও ঘনিষ্ঠ ; সম্ভবত ট্র্যাপ বুঝে বন্ধুকে পরামর্শ দিল কিছু। ঘাড় নেড়ে ক্রিজে ফিরে স্টান্স নিল কৌশিক। তৃতীয় বল, সুব্রত আসছে। তারপর, কিছু বুঝতে পারার আগেই ওরা দেখল মিডল স্টাম্প ছিটকে গেছে, বিহারের খেলোয়াড়দের উল্লাস আর মাঠজোড়া স্তব্ধতার মধ্যে ধীর পায়ে মাথা নিচু করে প্যাভেলিয়নে ফিরে আসছে কৌশিক। ওরই মধ্যে, সান্ত্বনার গলায় পাশের ভদ্রলোক বললেন, 'সেই ট্র্যাপেই পা দিল ! ব্যাড লাক।'

পরের দিন আর মাঠে যায়নি ওরা। দ্বিতীয় ইনিংসে কৌশিকের রান এগারো। তখনো কেউই বুঝতে পারেনি টেস্ট খেলা দূরের কথা, এই ধারাবাহিকতায় ক্রমশ রঞ্জিতে চান্স পাওয়াই কঠিন হয়ে উঠবে কৌশিকের।

শৌভিকের কথার কী জবাব দেবে ভাবতে ভাবতে কৌশিকের সেই প্রথম রঞ্জি খেলতে নামার দৃশ্যটাই ফিরে এলো চোখে। যাওয়া ও ফেরার মধ্যে এতটা তফাত ভাবা যায় না। মনে হচ্ছিল কৌশিকের নয়, মিডল স্ট্যাম্প ছিটকে গেছে শৌভিকেরই। এই যে ঘটনাটা ঘটল, এর লজ্জা, হতাশা সবই ওর ! অন্তরা জানে না আর কখনো ও কৌশিকের খেলা দেখতে গেছে কি না। তবে খোঁজখবর যে রাখে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

কাল টিভি-র খবর শেষ হবার পর শৌভিকের আগের কথার জের টেনে অন্তরা বলেছিল, 'কাল সকালের কাগজে দেখতে পাবে কত রান করল। এমনও তো হতে পারে টিম খারাপ খেললেও ও নিজে ভালো খেলেছে।'

'কত আর ভালো খেলবে !' শৌভিক বলল, 'চারশো সাতচল্লিশ করেছিল তামিলনাড়ু। ফলো-অন করা মানে গোটা দল দুশো সাতচল্লিশের বেশি কিছুতেই করেনি। উইকেট অ্যাভারেজে বাইশ। এই অবস্থায় খুব ভালো খেললেও কত করবে ! নিশ্চয়ই সেঞ্চুরি

পাবে না!'

অন্তরা জবাব দিল না, কোনো হিসেবেও গেল না। নিজের মনেই কিছু ভেবে, সময় নিয়ে বলল, 'টিম থেকে বাদ পড়ে খুব দমে গিয়েছিল—বলেছিল খেলা ছেড়ে দেবে। তার ওপর কাগজে ওই লেখালেখি! আমরাও কি ভেবেছিলাম দলে আসবে! কে জানত স্কুটার অ্যাক্সিডেন্ট করে হাত ভাঙবে মালহোত্রার, আর সে-জায়গায় ওকেই ডাকবে!'

'এটা লাকের ব্যাপার। আগের ম্যাচে মালহোত্রা সেঞ্চুরি পেয়েছিল—'

'লাকই তো!' অন্তরা বলল, 'তোমার দাদাও সেটা জানে। যাবার আগে বলল, হয়তো এটাই শেষ চান্স। হয় থাকব, না হয় যাব। খুব ডিটারমিন্ড্ লাগছিল ওকে। সেইজন্যেই মনে হচ্ছে—'

অন্তরা কথাগুলো শেষ করতে পারেনি। তার আগেই কনক এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'খোকার কথা কিছু বলল, টিভি-তে?'

'নাঃ।' শৌভিক বলল, 'বেঙ্গল আবার ধেড়িয়েছে, এটুকুই বলল। হেরেই ফিরবে।'

কনক ফিরে গেলেন। নিঃশব্দে।

চায়ের কাপটা শৌভিকের সামনে নামিয়ে রেখে আবার ব্যালকনি ঘুরে এলো অন্তরা। দেওরের সঙ্গে চোখাচোখি হতে বলল, 'কী দেখলে? খারাপ খেলেছে?'

'না। আর তিনটে রান পেলে হাফ-সেঞ্চুরি হতো। ব্যাড লাক। শেষ দুজন জিরোতেই গেছে। কী সব প্লেয়ার!'

'যাক গে। সাতচল্লিশ করলেও নট আউট তো থেকেছে। ইনিংসে সবচেয়ে বেশি স্কোর। ছ'জন আউট হবার পর ব্যাট করতে নামলে আর কিছু করার থাকে না!'

অন্তরা এইভাবেই যুক্তি সাজালো। শৌভিক কিছু বলছে না দেখে বলল, 'দ্যাখো, সেকেন্ড ইনিংসে কী করে। নট আউট ছিল বলেই বোধহয় ওকে ওপেন করতে পাঠিয়েছে। এখনই একুশ, যদি—'

বলতে বলতে থেমে গেল অন্তরা। টেলিফোন বাজছে। শৌভিক উঠতে যাচ্ছিল, ব্যস্ত ভঙ্গিতে ওকে নিরস্ত করে অন্তরা বলল, 'তুমি বসো,

আমি দেখছি—'

টেলিফোনটা থাকে লিভিং রুম সংলগ্ন প্যাসেজে, যাতে তিনটি ঘরের যে-কোনোটা থেকেই পেঁছনো যায়। কনক কখনোই ফোন ধরেন না, আর শৌভিক তো থাকেই না প্রায়। বাকি সে আর কৌশিক। এখন তো কৌশিকও নেই। তবু তাড়াতাড়ি টেলিফোন ধরার জন্যে এগোতে এগোতে অন্তরা ভাবল, তাদের শোবার ঘরে যেখানে সে ও শৌভিক বসেছিল, সেখান থেকে শৌভিকেরই উঠে আসা স্বাভাবিক ছিল, তবু সে ওকে নিরস্ত করল কেন! একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল নাকি!

ওদিকের গলা শুনে অবশ্য মনে হলো ঠিকই করেছে। অভিরূপকে চেনে না শৌভিক—অচেনা একজন পুরুষ বৌদিকে ফোন করছে, কথা বলতে চাইছে শুনলে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত ওর মনে। এখন কিছু জিজ্ঞেস করলে সে বানিয়ে বলতে পারবে।

অভিরূপ বলল, 'সরি, একটু আগেই ফোন করছি।'

আশপাশে কেউ নেই, তবু এদিক ওদিক দেখে নিয়ে গলার স্বর নামিয়ে অন্তরা বলল, 'তাই তো দেখছি—'

'আসলে আজ ডিরেক্ট অফিসে যাচ্ছি না, একটু অন্য জায়গায় যেতে হচ্ছে। ফিরতে লাঞ্চ পেরিয়ে যাবে।'

অন্তরা চুপ করে থাকল।

অভিরূপ বলল, 'তোমার মনে আছে কি না চেক করতে চাইলাম—'

'আছে।'

'ক'টায় বলো তো?'

'পাঁচটা চল্লিশ—'

'আমি অবশ্য আগেই পেঁছে যাব।'

'ঠিক আছে—'

চাপা হাসির শব্দে সামান্য মুখর হয়ে উঠল অভিরূপ। বলল, 'কী ব্যাপার! কর্তা তো মাদ্রাজে, শাশুড়ীও নিশ্চয়ই পুজোর ঘরে। এত চেপেচুপে কথা বলছ!'

জবাব দেবার আগে আরো একবার আশপাশ দেখে নিয়ে অন্তরা

বলল, 'দেখা হলে বলব।'

'তাহলে রাখছি ?'

'হ্যাঁ।'

অন্তরা টের পেল এই সামান্য কথাবার্তাতেই কপালে ঘাম ফুটেছে তার, দ্রুত লাগছে নিঃশ্বাস। এখন তাকে দেখলে যে-কেউই উত্তেজনার আভাস পাবে। সরাসরি ঘরে না ফিরে আঁচল তুলে মুখ মুছল সে, তাতেও নিশ্চিন্ত না হতে পেরে বাথরুমে গিয়ে জল দিল চোখেমুখে, বেরিয়ে এসে উঁকি দিল পুজোর ঘরে—কনক তখনো মগ্ন দেখে আবার ফিরে এলো নিজের ঘরে।

খাটে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট টানছে শৌভিক, চোখ খবরের কাগজের ফ্রন্ট পেজ-এ। সে কিছু বলবার আগেই অন্তরা বলল, 'বাঃ, বেশ তো! সিগারেট ধরালে!'

'দাদা তো নেই—মনে হলো একটা খাওয়া যাক।'

'তোমাকে না ছেড়ে দিতে বলেছিলাম!' কানে তখনো অভিরূপের গলা, বলতে হয় বলেই অন্তরা বলল, 'খুব খারাপ।'

অল্প হাসল শৌভিক, গা করল না যেন। তারপর সোজাসুজি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কার ফোন ?'

শৌভিকের বলার ধরনে কখনো কখনো কৌশিক এসে যায়। প্রশ্নটা আসবে ভেবে জবাবটা আগেই তৈরি করে রেখেছিল অন্তরা। একটুও দ্বিধা না করে বলল, 'মাধুর। আজ মা'র কাছে যাব বলেছিলাম। যাচ্ছি কি না জানতে চাইল।'

'কখন যাবে ?'

'বিকেলে। পাঁচটার পর। তার আগে গেলে তো সকলের সঙ্গে দেখা হয় না।' এ পর্যন্ত বলে অন্তরা জুড়ে দিল, 'সাড়ে আটটা, ন'টার মধ্যেই ফিরব।'

'ও।' সিগারেটটা চায়ের কাপে গুঁজে উঠে দাঁড়াল শৌভিক। আড়মোড়া ভাঙার ধরনে দুটো হাত দু'দিকে ছড়িয়ে বলল, 'আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার আছে। টালিগঞ্জে। তাহলে আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ভাত দিও। আমি না হয় ছ'টার মধ্যেই ফিরে আসব। মা একা থাকে।'

'দ্যাট্স লাইক এ গুড বয়।' অন্তরা বলল, 'অবশ্য পুষ্পও থাকবে আমি না ফেরা পর্যন্ত।'

ঘরের মাঝখানেই কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল শৌভিক। তারপর বলল, 'ম্যাচটা রিলে করলে জানা যেত দাদা কী করল। খেলা শুরুর সময় হয়ে এলো।'

'কী আর করা যাবে! অন্তরা বলল, 'দুপুরের নিউজে যদি কিছু বলে!' বলতে বলতেই ভাবল, আমি কি সত্যিই কৌশিককে ভালোবাসি ?

প্রশ্নটা তার নিজের কাছে নিজেরই, উঠলেও ঠিকঠাক কোনো উত্তর খুঁজে পেল না অন্তরা। বরং দিন যত এগোতে লাগল ততই মনের মধ্যে একটা অসহিষ্ণুতা টের পেতে লাগল সে। কিছুই ভালো লাগছে না ; কোনোরকমে সকাল, দুপুর কাটিয়ে বিকেলে পৌঁছনোর তাগিদ থাকলেও যে-চাপা উত্তেজনায় অভিরূপের ফোন পাবার পর থেকে বেশ কিছুটা সময় অন্যরকম লাগছিল নিজেকে, সেটাও থিতিয়ে এলো ক্রমশ।

সংসারের যে কাজগুলো প্রতিদিন না করলেই নয়—কখনো অভ্যাসে কখনো বা আলস্য নিয়ে সেই কাজগুলোর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে ফেলতে এক সময় স্পষ্টই অনুভব করল সে জড়িয়ে যাচ্ছে অন্য প্রশ্নে। আসলে, আজ সকালে, শৌভিক যখন তার দাদার জন্যে বাড়তি আগ্রহ এবং উদ্বেগ দেখালো, তখন হঠাৎই তার মনে হয়েছিল শৌভিকের সঙ্গে এতক্ষণের কথাবার্তায় শুধু কথার পিঠে কথাই সাজিয়ে গেছে সে, গভীর হয়নি, তার মন পড়েছিল অভিরূপের দিকে। শুধু তা-ই নয়, টেলিফোনে অভিরূপের সঙ্গে বিকেলে দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাকা হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখানোর জন্যে সহজেই বলে ফেলল কতগুলো মিথ্যা। তখনই ভেবেছিল, নিজেকে নিজের অস্তিত্বে টিকিয়ে রাখার জন্যে যে-মেয়ের স্বামী প্রায় মরণপণ লড়ছে, দূরত্বে থেকেও তার কি উচিত নয় শুধু তারই কথা চিন্তা করা! যাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে, বিয়ের পরেও শুধু তাকেই ভালো-বাসবে, স্ত্রী হিসেবে এরকম একটা শর্ত মেনে চলা কি তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না ?

অন্তরা দ্বিধায় পড়ল। নিজের অনুভূতিগুলোকে চেনার চেষ্টায় নতুন করে আক্রান্ত হলো ধন্ধে। সে তো জানেই, অভিরূপের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়া এবং নতুন করে জড়িয়ে পড়ার পরেও কেটে গেছে বেশ কিছুদিন, কৌশিক তার কিছুই জানে না। মাঝেমধ্যে কথা-কাটাকাটি, তর্ক, কয়েক ঘণ্টা কথাবার্তা বন্ধ—এগুলো অভিরূপের সঙ্গে দেখা হবার আগেও ছিল। কিন্তু, এটাও তো সত্যি যে গোপন এই মেলামেশা শুরু হবার পরেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে আলাদা সম্পর্ক, সেটা যেমন ছিল তেমনই রয়েছে। অন্ধকার বিছানায় শরীরে শরীর ঘষার মুহূর্তগুলোয় ভাটা পড়েনি কোনো ; বরং, অন্তরা কী করে অস্বীকার করবে, আজকাল এসব সময় অভিরূপের কথা ভেবে সে এক ধরনের বাড়তি উদ্যম পায়, কৌশিককেও আস্কারা দেয় আরো বেশি উদ্দাম হবার জন্যে! যেন সম্ভব হোক বা অসম্ভব, এসবের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে সে।

কৌশিক সন্দেহ করবে কেন! ডালমিয়ার মেয়ের বিয়েতে কি স্নেহাশিসের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারির পার্টিতে কৌশিকেরই স্ত্রী হয়ে যেতে তো কোনো অসুবিধে হয়নি তার! এই যে হঠাৎই টিমে ডাক পেয়ে মাদ্রাজে খেলতে গেল, অনভ্যাস থেকে আবার ওকে অভ্যাসে ফিরিয়ে আনার জন্যে ব্যস্ত হতে হলো তাকেই। যাবার আগে কৌশিক যখন নিজের কিট গোছাচ্ছে, তখন ওর অন্যান্য প্রয়োজনগুলো খেয়াল রেখে সাবধানে সুটকেস গুছিয়ে দিয়েছে সে ; স্নেহাশিসের বউ মন্দিরা স্টেশনে যাবে শুনে কৌশিকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে গিয়েছিল স্টেশনে। এগুলো কি ভালোবাসা নয়? ভালোবাসা—বিশেষত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে—তাহলে কি শুধুই অভ্যাস? একত্র বাসের পারস্পরিকতায় অভ্যস্ত হতে হতে যে যান্ত্রিকতা এসে যায়, তা থেকে কি কখনোই মুক্ত হওয়া যায় না? না কি সে এভাবে ভাবছে বলেই মনে হচ্ছে এরকম, এগুলো শুধু তারই ধারণা ; অন্যরা অন্য কথা বলবে?

অন্তরার মনে পড়ল, সেদিন হাওড়া স্টেশনে ওদের সি-অফ্ করতে গিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিল সে। ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্তে স্নেহাশিস যখন হাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করল মন্দিরাকে, তখন ক'মুহূর্ত

স্বামীর আরো বেশি সান্নিধ্যে ঘেঁষে থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে মন্দিরা বলেছিল, 'খারাপ খেলার শাস্তি কি, তা মনে থাকে যেন!' খুবই একান্ত আর ব্যক্তিগত কথা, অন্তরা তার অর্থ বোঝেনি। শুধু লক্ষ করেছিল, স্নেহাশিসের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা কৌশিকের মুখচোখে ভাবান্তর নেই কোনো, সামান্য বিষণ্ণ, যেন দৃশ্যটা লক্ষই করেনি সে। স্বামীকে ওই অবস্থায় দেখে অন্তরাও বলতে পারেনি কিছু। তাড়া-হুড়ো করে কম্পার্টমেন্টে ওঠার আগে শুধু একবার পিছনে তাকিয়ে তাকে দেখেছিল কৌশিক, ঘাড় নেড়েছিল অল্প, যেন এর বেশি কিছুই করার ছিল না। অন্তরা ভেবেছিল হাত নাড়বে, কিন্তু ঘটনাগুলো এমন অদ্ভুতভাবে ঘটল যে সেই মুহূর্তে ছেঁকে ধরা শারীরিক মন্থরতায় সাড় পেল না কোনো। ট্রেন চলে গেল।

স্টেশন থেকে মন্দিরার গাড়িতেই বাড়ি ফিরেছিল সে। মেয়েটি মিশুকে ও ভদ্র, তারই বয়সের; যেতে যেতে নানারকম গল্প করলেও নিজের আড়ষ্টতা বোধ থেকে হ্যাঁ-হুঁ করা ছাড়া বিশেষ কিছুই বলতে পারেনি অন্তরা। বস্তুত তখনো সে আটকে ছিল একটু আগে দেখা স্টেশনের দৃশ্যে—দুজনেই খেলতে গেল, কিন্তু দু'রকম ভাবে!

অনেকক্ষণ পরে তার মনে হয়, আসলে সে ভুলই ভাবছে। পাশা-পাশি দাঁড়িয়ে থাকলেও স্নেহাশিস আর কৌশিকের মধ্যে তফাত অনেকখানি। স্নেহাশিস এরই মধ্যে দুটো টেস্ট খেলেছে, ইংল্যান্ড ট্যুরে ষোল জনের দলে ছিল, গত দু'বছরে ন্যাশন্যাল টিমে ডাক না পেলেও যে-কোনো সময়ে ডাক পেতে পারে আবার। যেটা বড় কথা, বাংলা টিমের টু-ডাউনে তার জায়গা বাঁধা। আর কৌশিক? অ্যাক্সিডেন্টে মালহোত্রার হাত না ভাঙলে হঠাৎ শিকে ছিঁড়ত না ওর কপালে; তামিলনাড়ু ম্যাচে চোদ্দ জনের দলে জায়গা পেলেও শেষ পর্যন্ত মাঠে নামবে কি না তা অনিশ্চিত। এই অবস্থায় এক ভিড় লোকের মাঝখানে কোন খেয়ালে সে বউকে কাছে টানবে! এতদিনের এত কথাবার্তার মধ্যে সে কি বুঝতে পারেনি কেন অন্তরা তাকে বিয়ে করেছিল এবং সম্ভাব্য কারণগুলো থেকে সে কতটা দূরে সরে এসেছে! এমনও হতে পারে, কৌশিক যে তাকে স্টেশনে যেতে বারণ করেছিল, অন্তরা জেদ করায় রাজি হয় শেষ পর্যন্ত, তার কারণও একই। হয়তো ভেবেছিল,

অন্তরা আর মন্দিরার মধ্যে তফাত আছে, অন্তরা সি-অফ্ করতে গেছে দেখলে দলের অন্যরা তাকেই করুণা করবে, হাসবে মনে মনে। হয়তো সেইজন্যেই, ট্রেন ছেড়ে দেবার মুহূর্তেও, তাকে চিনেও না চেনার ভান করল।

এভাবে ভাবলেও, আজ হঠাৎ একটা অন্য কথা মনে হলো অন্তরার। এমন কি হতে পারে যে কৌশিক ভেবেছে একটার পর একটা ব্যর্থতার পর তার এই দলে ফেরার ঘটনায় অন্তরার উৎসাহের সবটাই স্বার্থ-প্রসূত, যাতে নিজের ভেঙে যাওয়া স্বপ্নগুলোকে আবার জোড়া লাগাতে পারে, মুখ দেখাতে পারে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে? এর মধ্যে ভালোবাসা কোথায়! ও কি ধরেই নিয়েছে, যদি আবারও ব্যর্থ হয়—দলে জায়গা না পায় কিংবা জায়গা পেয়েও ব্যাটে বলে কিছু করতে না পারে, তাহলে তার ফিরে আসার জন্যে কোনো আলাদা অপেক্ষায় থাকবে না অন্তরা!

হতে পারে, এমন ভাবনা অসম্ভব নয়। অন্তত স্টেশনে যাবার সময় কৌশিক যখন কাঠ হয়ে বসেছিল ট্যাক্সিতে, কথা বলছিল না, তখন অন্তরার মনে হয়েছিল বড্ড বেশি টেনস্ হয়ে আছে কৌশিক—যেন জোর করে পাঠানো হচ্ছে তাকে, এতদিন যেমন চলছিল তেমন চললেও ক্ষতি ছিল না। হয়তো আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে না।

ব্যাপারটা ভালো লাগেনি অন্তরার। ওকে কিছুটা খোলামেলা করার জন্যেই বলেছিল, 'তুমি এত গম্ভীর হয়ে আছ কেন!'

কৌশিক নিশ্চয়ই অন্য কিছু ভাবছিল। জবাব দেবার ধরনেই ওর অন্যমনস্কতা স্পট হয়ে উঠল।

'গম্ভীর! না তো!'

'না বললেই হবে!' অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টায় অন্তরা বলল, 'এই যে চোয়াল এ'টে বসে আছ, এটা মাঠে যখন ব্যাট করতে নামবে তখন করো।'

কৌশিক জবাব দিল না। অস্ফুট হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

অন্তরা তখনই বলে ফেলেছিল কথাটা, 'আমি চাইছি তুমি এবার সেঞ্চুরি করো।'

কৌশিক তাকাল। তারপর হঠাৎই বলল, 'ঠাট্টা করছ!'

উত্তরটা যে এভাবেই আসবে তা ভাবতে পারেনি অন্তরা। অবাক হলো, কিছুটা অপ্রস্তুতও। ইদানীং লক্ষ করছে কৌশিকের কোনো কোনো কথা হঠাৎই চিড় ধরিয়ে দেয় স্বাভাবিকতায়। কিন্তু, আজ এখন, এমন কী কথা বলেছে সে, যাতে কৌশিকের এরকম প্রতিক্রিয়া হবে!

অন্তরা ভাবল সে চুপই করে থাকবে, পাছে কথাবার্তা অন্যদিকে মোড় নেয়, টেনশন বেড়ে যায় কৌশিকের। তেমন কিছু হলে তার প্রভাব পড়বে ওর খেলাতেও। তখন এমনও হতে পারে মুখ না বললেও মনে মনে তাকেই দোষী করবে কৌশিক। আজ সকালেই বলেছিল, স্টেশনে গিয়ে সি-অফ্ করলেই কি আমার খেলা খুলে যাবে!' নিতান্তই কথার কথা ভেবে অন্তরা বলেছিল, 'যেতেও তো পারে!' কৌশিক কথা বাড়ায়নি।

পরের কয়েকটি মুহূর্ত কেটেছিল নিঃশব্দে, যেন একই ট্যাক্সিতে গেলেও দুই ভাড়া শেয়ার-করা যাত্রী ওরা—স্বামী-স্ত্রী নয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিজেকে সামলাতে পারেনি অন্তরা। চাপা অভিমানে ক্ষুব্ধ, আরো কিছুদূর এগিয়ে বলেছিল, 'একটা ভালো কথা বললাম, সেটাও তোমার ঠাট্টা মনে হলো! কেন, তুমি একটা সেঞ্চুরি করলে, ভালো খেললে কি আমার খারাপ লাগবে!'

'আমি তা বলিনি!'

'বললে না, ঠাট্টা করছি!'

'বলেছি। অন্যমনস্কতা থেকে মুখ ফিরিয়ে কৌশিক বলল, 'দোষটা আমারই। আজকাল এসব কথা শুনে ঠাট্টাই মনে হয়।'

কৌশিকের গলার স্বর অন্যরকম, কিছুদিন আগে কাগজে ওর বিরুদ্ধে লেখা বেরুনোর পর অফিস থেকে ফিরে যে-গলায় কথা বলেছিল, প্রায় সেই গলা। অন্তরা বুঝতে পারল না কীভাবে সহজ করবে ওকে।

'আমার কী মনে হয় জানো!' মুখে বিষণ্ণ হাসি, কৌশিকই বলল আবার, 'তুমি ক্রিকেটার কৌশিক দত্তকে বিয়ে করেছিলে—আমাকে নয়। বার বার সেই কথাটাই মনে করিয়ে দাও।'

অন্তরা হঠাৎই অসহিষ্ণু বোধ করল। বলল, 'আমার কথা ভাবতে হবে না। তুমি খেলার কথা ভাবো। যে চান্স পেলে সেটা কাজে লাগানোর কথা ভাবো।'

'রাগ করলে?' অন্তরার বলার ধরনেই সম্ভবত একটু নরম হয়ে এলো কৌশিক। হাতটা স্ত্রীর কাঁধে রেখে বলল, 'সেঞ্চুরি অনেক দূরে। তার আগে পঁচিশ, পঞ্চাশ পেরোতে হবে। তারও আগে দলে ঢুকতে হবে।'

জবাব না দিয়ে ওর স্পর্শটাকেই অনুভব করার চেষ্টা করল অন্তরা। আড়ে তাকিয়ে দেখল কৌশিক তাকে দেখছে না, চোখ সামনে, এক ধরনের কাঠিন্য ফুটে উঠেছে চোয়ালে।

'তুমি আলাদা করে বলবে কেন!' কৌশিক বলল, 'দলে ঢুকলেও হয়ত এটাই আমার লাস্ট চান্স। হয় থাকব, না হয় যাব।'

কাজের মধ্যে থাকলেও কৌশিকের যাবার দিনের ঘটনা ও কথাবার্তাই বার বার ফিরে আসছিল অন্তরার মনে। কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া লাগছিল নিজেকে, এবং অন্যমনস্ক, এতটাই যে বেরুবার আগে খেতে বসে কৌশিক বলেই ফেলল, 'বৌদি, তোমাকে এত ওয়ারিড লাগছে কেন!'

'তোমার তাই মনে হচ্ছে!' হাসবার চেষ্টা করলেও হাসিটা যে স্পষ্ট হলো না তা নিজেই বুঝতে পারল অন্তরা।

শৌভিক উঠছিল। বলল, 'এখন নয়, সকাল থেকেই মনে হচ্ছে—'

'জানি না।' পাশ-কাটানো গলায় অন্তরা বলল, 'এক ধরনের টেনশন তো হয়ই।'

'দাদার জন্যে?' এঁটো হাত ধুতে বেসিনের দিকে গেল শৌভিক। তোয়ালেয় মুখ মুছে ফিরে এসে বলল, 'আমারও হচ্ছে। কিন্তু, সকালের কাগজে রিপোর্ট পড়ে মনে হলো বেশ কনফিডেন্টলিই খেলেছে। সাতচল্লিশ রানের মধ্যে সাতটা চার—এর আগে সবগুলো রঞ্জি ইনিংস মিলিয়েও এতগুলো চার মারেনি! যদি ভালোই না খেলত তাহলে সেকেন্ড ইনিংসে ওপেন করতে পাঠাতো না!'

শৌভিক যেন ধরেই নিয়েছে সে যা-যা ভাবছে অন্তরাও

সেই সব ভাবছে। একটু থেমে থেকে ব্যস্ত হতে হতে বলল, 'দুপুরের টিভি নিউজটা শুনো। যদি বলে দু' উইকেটেই আছে তাহলে ধরে নিও ভালোই খেলছে। অবশ্য—,' ভেবে বলল শৌভিক 'আরো উইকেট পড়লেও দাদারটাই পড়বে তার কোনো মানে নেই।'

অন্তরা জবাব দিল না। নিজেকে আড়াল করার জন্যে হাসিটুকু জিইয়ে রেখে লিফ্‌ট পর্যন্ত এগিয়ে দিল শৌভিককে।

'তুমি তাহলে পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটায় ফিরছ?'

'ওই রকমই হবে।' লিফ্‌টে ঢুকে পড়ার আগে শৌভিক বলল, 'তুমি তোমার মতো চলে যেও।'

শৌভিক চলে যাবার পরেও নড়ল না অন্তরা। শীত-ছোঁয়ানো হাওয়ায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণের চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ভাবল, হয়তো ঠিকই বুঝেছে কৌশিক। ছোটখাটো ঘটনা ও পারস্পরিক কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে এগোতে এগোতে বুঝে নিয়েছে কৌশিককে নয়—একজন ক্রিকেটারকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল অন্তরা, ঘটনাচক্রে যে কৌশিকের রূপ ধরেই আসে। কিংবা ক্রিকেটার হিসেবে ওর সম্ভাবনাই তাকে আকর্ষণ করেছিল বেশি, ক্রমশ অন্তরঙ্গ হয়ে. ওঠার সেই দিনগুলিতে একবারও মনে আসেনি কৌশিক ব্যর্থও হতে পারে। খুব ভুল বুঝেছে কি কৌশিক?

সম্ভবত না। কৌশিক না জানুক, অন্তরা তো জানে, সেই কলেজে পড়ার সময় থেকে অভিরূপের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে সে ধরেই নিয়েছিল ওর সঙ্গেই তার বিয়ে হবে। নন্দাও তা-ই জানত, প্রশ্রয় দিত, ঠাট্টা করে মাঝে মাঝে তাকে সম্বোধন করত 'বৌদি' বলে। সত্যি, কী সব ছেলেমানুষিই না করত তখন!

কিন্তু অভিরূপের সঙ্গে তখনকার সম্পর্কটাও কি ছেলেমানুষিই ছিল! ভালোবাসা? ছিল না? বিয়েটা হয়নি, কিন্তু শুধু মন নয়, কিছুটা শরীর দিয়েও কি সে তখনই অভিরূপকে আকাঙ্ক্ষা করতে শুরু করেনি! এই যে কৌশিকের সঙ্গে পরিচয়, সেও তো অভিরূপের সঙ্গে রোয়িং ক্লাবের অ্যানুয়াল পার্টিতে গিয়ে! তারপর? এখন মনে

হয় তার পরের ঘটনাগুলোই ধাঁধা। অফিসের দায়িত্ব নিয়ে সেই সময় কয়েক মাসের জন্যে অভিরূপ বোম্বাই না গেলেও কি কৌশিক এসে যেত তার জীবনে! উঠতি ক্রিকেটার, নাম বেরোচ্ছে, ছবি ছাপা হচ্ছে কাগজে—প্রায় একটা সেলিব্রিটি হবার দিকে এগোচ্ছে কৌশিক, এ ছাড়া আর কোনো আকর্ষণ কি ছিল তার যে কিছুদিনের মধ্যেই অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ল অভিরূপ, আর প্রায় জোর করে কৌশিককে নিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে ছুটে গেল সে! তাহলে কি অভিরূপকে ভালোবাসত না সে—সেই বয়সের মোহে ক্রমশ জড়িয়ে পড়েছিল যে-কোনো একজন পুরুষের সঙ্গে, যাকে পছন্দ করা যায়? সে কি কৌশিককেও ভালোবাসতে পেরেছে? এমন কি হতে পারে যে, সে নিজে নিজেকে যতটা না চেনে, তার চেয়ে বেশি চেনে কৌশিক। তা না হলে সেদিন ট্যাক্সিতে যেতে যেতে হঠাৎ ওই কথাগুলো বলল কেন!

প্রশ্নগুলো আসছে, পর পর, কিন্তু একটু উল্টোপাল্টা হয়ে, কোনোটারই উত্তর ধরা দিচ্ছে না ঠিকঠাক। কেন মাঝখানে এক-দু' পাতা ছেঁড়া কোনো উপন্যাস, অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেলেও থেমে যেতে হচ্ছে থেকে থেকে, মনে হচ্ছে ওই দুটো পাতাতেই ছিল এমন কিছু, যা জানলে এমন খাপছাড়া লাগত না। সেই সকালে শোনা শিশুর কান্নার মতো—বোধ আর অভিজ্ঞতা কোথাও মিলছে না এক জায়গায়। তাহলে কি যেসব অনুভূতিকে সে ভালোবাসা ভেবে এসেছে এতদিন, সেগুলো ছিল শুধুই আকর্ষণ, শিকড় পায়নি! তবে কি নিজের সঙ্গেই প্রতারণা করল সে!

আজ সকালে হঠাৎ মনে হয়েছিল দিনটা খারাপ যাবে। তখন এসব প্রশ্ন মাথায় ছিল না। বরং শৌভিকের সঙ্গে কথাবার্তা ও তারপরে অভিরূপের টেলিফোন পাওয়া পর্যন্ত বেশ স্বচ্ছন্দ লাগছিল নিজেকে। তারপর হঠাৎই যেন গোলমাল হয়ে গেল সব! যেসব ঘটনা ও কথা এসেছে ও চলে গেছে—এখন প্রায় পুরনো ও ভুলে যাওয়া বলেই মনে হয়, সেগুলো সবই যেন একসঙ্গে এসে উত্তর খুঁজছে তার কাছে! মনে হচ্ছে এই সাতাশ-আঠাশ বয়সেই পেরিয়ে এসেছে অনেক অভিজ্ঞতা, সমস্ত অভিজ্ঞতা ভারী হয়ে চেপে বসেছে বুকে।

জোর করে এই অবস্থাটা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল অন্তরা। ভুল যদি করেই থাকে, তার দায় সে একাই বহন করবে কেন! কৌশিককে ঘিরে যদি কোনো স্বপ্ন সে দেখেই থাকে, সে-স্বপ্ন কৌশিকই দেখিয়েছিল। উচ্চাশায় টগবগে, তখন কি একবারও সে বলেছিল, ক্রিকেটের পোশাকে আমাকে দেখো না, আমি সাধারণ—খুবই সাধারণ! তা হলে আজ এই অনুযোগ কেন! স্ত্রী হিসেবে এই ক'বছরে অন্তরাই বা কি কম দিয়েছে তাকে! এর পরেও যদি কিছু না-পাওয়ার ক্লান্তি এসে যায় তার মনে—যদি মনে হয় অভিরূপকে প্রত্যাখ্যান করে ভুল করেছিল, সেই দোষও তার? আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিগত বলে তার কি কিছুই থাকবে না! এখনো সময় আছে, একেবারে সাধারণ হয়ে হেজেমেজে যাবার আগে যদি আগের ভুল শুধরে নেবার সুযোগ পায়, কেন ছেড়ে দেবে সেই সুযোগ!

শৌভিক তাকে অন্যমনস্ক দেখেছিল, একসঙ্গে খেতে বসে কনকও তুললেন কথাটা।

'চার-পাঁচদিন হয়ে গেল, খোকা কোনো ফোনটোন করেনি, বউমা?'

'করলে তো বলতামই আপনাকে—'

কনক তাকালেন। ভাতের থালায় ওঁর হাত থেমে যেতে অন্তরা বুঝতে পারল তার সঙ্গে কৌশিকের যা সম্পর্ক কনকের সঙ্গে সম্পর্কটা তার চেয়ে আলাদা। এভাবে বলা ঠিক হয়নি।

দু'এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে অন্তরা বলল, 'ও ভালোই আছে। কালকের খেলার খবর আজ বেরিয়েছে কাগজে, ভালো খেলেছে। আপনি চিন্তা করবেন না।'

কনক আবার খাওয়ায় মন দিলেও ওঁর মুখের ভাব দেখে মনে হলো উত্তরটা মনঃপূত হয়নি। চিন্তাটাও থেকে গেছে। একটু পরে নিজেই বললেন, 'আগে বাইরে গেলে নিজেই ফোন করত। ও তো জানে আমরা ভাবব। শুভু এসেছে, সেটাও তো জানে না।'

অন্তরা চুপ করে থাকল।

কনক আবার সময় নিলেন। তারপর বললেন, 'তুমি একটা ফোন করলে না কেন?'

কনকের উদ্বেগটা কোথায় এবং কী কারণে, এই মুহূর্তে তা ঠিক বোধগম্য হলো না অন্তরার। বলল, 'দলের সঙ্গে গেল, কোথায় উঠবে পরিষ্কার বলে যায়নি। বলেছিল কবে ফিরছে ফোন করে জানাবে।'

এ পর্যন্ত বলে থেমে গেল অন্তরা। পরে জুড়ে দিল, 'কালই তো খেলার শেষ দিন। হয়তো আজ রাতে করবে, কিংবা কাল।'

কনক আর কিছু জিজ্ঞেস না করলেও অন্তরার মনে হলো যে-চিন্তা থেকে কথাগুলো বলেছিলেন সেটা থেকেই গেছে ওঁর মনে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার খেয়াল হলো আজ বিকেলে সে অভিরূপের কাছে যাবে। বাড়ি থাকবে না, পাইকপাড়ায় বাপের বাড়ি যাবে—শৌভিককে এভাবে বোঝালেও কনককে এখনো কিছু বলেনি। নিতান্তই প্রয়োজন না হলে এ বাড়িতে শাশুড়ীর সঙ্গে তার যেটুকু কথাবার্তা হয় তা এই খাবার সময়। কিন্তু, এখনই কথাটা তোলা কি ঠিক হবে! ছেলের চিন্তায় অশান্ত, এখন সে কিছু বললে স্বার্থপর ভাবতে পারেন।

খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসতে আসতে আইডিয়া খেলে গেল মাথায়। যে-মানসিক অবস্থা নিয়ে খেলতে গেল কৌশিক তাতে ওর বাড়িতে ফোন না-করাটা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু স্নেহাশিস কি ফোন করেনি মন্দিরাকে? বাইরে খেলতে গেলে স্নেহাশিস রোজই ফোন করে, সেদিন স্টেশন থেকে ফেরার সময় মন্দিরা নিজেই বলেছিল কথাটা। ওকে ফোন করলেই তো জানা যাবে কৌশিকের খবর। কনকও বুঝবেন ছেলেকে খেলতে পাঠিয়ে তাঁর পুত্রবধূ গ্যাঁট হয়ে বসে নেই।

একটা বেজে গেছে। তা হোক, এখন এমন কিছু অবেলা নয় যে পরিচিত কাউকে ফোন করা যাবে না। অন্তরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ফোন মন্দিরাই ধরল। স্নেহাশিস ফোন করেছিল কি না জিজ্ঞেস করায় বলল, 'কাল রাত্রেই তো করেছিল। কেন, তোমার বর করেনি?'

অন্তরা অস্বস্তিতে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবল, সে মন্দিরা নয়। এখন তাকে আরো একটা মিথ্যে কথা বলতে হবে।

'করেছিল হয়তো—', অন্তরা বলল, 'আমাদের ফোনটা একটু গোলমাল করছে ক'দিন, ইনকামিং কলগুলো আসছে না ঠিকঠাক।

ওরা সব ভালো আছে তো ?'

'ওরা তো ভালো আছে। টিম ধ্যাড়াচ্ছে। কাল খুব খিস্তি করলাম ওকে।' মন্দিরা একটু থামল। বলল, 'কৌশিক কিন্তু ভালো খেলেছে—'

'কোথায় আর! হাফ সেঞ্চুরিও পেল না!'

'সেটা ওর দোষ নয়।' মন্দিরা বলল, 'স্নেহাশিস বলছিল কৌশিককে দেখে মনে হচ্ছিল চার বছর আগেকার ফর্ম ফিরে পেয়েছে একটাও ভুল স্ট্রোক নেয়নি—'

অন্তরা চুপ করে থাকল।

'তুমি তো জানো ওরা কত বন্ধু।' আগের কথার জের টেনে বলল মন্দিরা, 'ও প্রায়ই বলে, কৌশিক কী ট্যালেন্ট নিয়ে এসেছিল, আর কোথায় তলিয়ে গেল!'

শেষের শব্দদুটোই আঁকড়ে ধরল অন্তরা, যেন সে নিজেই তলিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে আড়াল করে বলল. 'দ্যাখো আজ কী করে। আমি টিভি শুনব বলে বসে আছি।'

'তা হলে লেটেস্ট স্কোর জানো না! আমি একটু আগে রেডিও নিউজ শুনেছি। লাঞ্চ স্কোর, এইট্টি-সিক্স ফর টু। ওরা দুজনেই খেলছে। তবে বড্ড স্লো, দু'ঘণ্টায় মোটে বাহান্ন রান!'

এ বাড়িতে রেডিও, ট্রানজিস্টর শোনার পাট উঠে গেছে অনেক-দিন। দ্রুত একটা হিসেবে পৌঁছতে চাইল অন্তরা। না, মাত্র বাহান্ন রান থেকে বোঝা যাবে না কৌশিক পঞ্চাশ করল কি না।

টেলিফোন ছেড়ে দেবার আগে একটু বা আশ্বস্ত গলায় সে বলল, 'দ্যাখো কী হয়!'

দু' উইকেটে ছিয়াশি, আজ সকাল থেকে লাঞ্চ পর্যন্ত আর উইকেট পড়েনি এবং স্নেহাশিসের সঙ্গে জুটি বেঁধে এখনো ব্যাট করছে কৌশিক—টেলিফোনে মন্দিরার কাছে এসব শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হলেও আলাদাভাবে খুশি হলো না অন্তরা। এমনকি খবর পেয়েই গেছে ভেবে টিভি নিউজও শুনল না দুপুরে। বরং তার মনে হলো, এই যে সে মন্দিরাকে ফোন করল, এটা তার তলিয়ে যাওয়া স্বামী আবার ভেসে উঠেছে কি না জানবার জন্যে নয়। খেতে

বসে কনক একটা নতুন টেনশন তৈরি না করলে এসব দরকার হতো না। এখন নিশ্চিন্ত, কনককে বলতে পারবে কৌশিককে নিয়ে চিন্তা করার সত্যিই কিছু নেই। বলতে পারবে বিকেলে সে মা'র কাছে যাবে, শৌভিক বাড়ি ফিরে আসবে, সুতরাং অন্তরা তাঁকে একা ফেলে যাচ্ছে ভাববারও কারণ নেই। আর কৌশিকের বাড়িতে ফোন না-করার দায়িত্ব সে নিতে যাবে কেন!

এইভাবে নিজেকে গুছিয়ে ফেলতে পারলেও অভিরূপের সঙ্গে দেখা করার সময় যত এগিয়ে আসতে লাগল ততই নতুন ক্ষোভে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল অন্তরা। মন্দিরা হঠাৎ এত সহানুভূতি জানাতে গেল কেন! ও কি বোঝাতে চাইল এই মুহূর্তে একই টিমে একসঙ্গে জুটি বেঁধে খেললেও বস্তুত তফাত আছে স্নেহাশিস আর কৌশিকের মধ্যে, সুতরাং মন্দিরা আর অন্তরার মধ্যেও? হতে পারে, যতই চেষ্টা করুক মন্দিরা, গলার স্বর কি এড়াতে পারবে!

বাড়িতে কি একান্তে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আবদ্ধ থাকতে থাকতে এই ব্যাপারটা আগে টের পায়নি অন্তরা। হঠাৎ মনে হলো, ব্যর্থ হতে হতে কৌশিক তাহলে এমনই অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে তার বন্ধু আর সহ খেলোয়াড়রা তাকে করুণা ছাড়া আর কিছু করে না। কৌশিকও নিশ্চয়ই জানে সে-কথা, আর জানে বলেই কি সেদিন ট্যাক্সিতে ওই ভাবে রিঅ্যাক্ট করেছিল তার কথায়!

হতে পারে। সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী হলেই দুটো মানুষ একাত্ম থাকবে সব সময়, কোনোরকম দূরত্ব থাকবে না তাদের নৈকট্যে, কোনো আড়াল তৈরি হবে না দুজনের মধ্যে, কেউ কি জোর দিয়ে বলতে পারে তা! অন্তরাও কি জানত? এসব আগে জানলে সে হয়তো সেদিন সেঞ্চুরি করার কথা বলত না কৌশিককে। যে তলিয়েই গেছে সে হঠাৎ একটা হাফ-সেঞ্চুরী বা সেঞ্চুরি করে ফেললে কতটাই আর উঠবে! শুধু খবরের কাগজের রিপোর্টারই নয়, মাঠে যাদের সঙ্গে, যাদের মধ্যে ওর ঘোরাফেরা তারাও ব্যাপারটাকে ফ্লুক ভাবতে পারে। এর পরে যদি আবার বাদ পড়ে, তাহলে হয়তো বরাবরের মতোই পড়বে। এবার মালহোত্রার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বলে পরের বার আর কারও হবে এবং দলে ঢুকবে কৌশিক—এটা কি তারও

ভবিষ্যৎ !

এসব ভাবতে ভাবতেই নিজের মধ্যে ঘন হয়ে উঠল অন্তরা। বিকেলে অভিরূপের সঙ্গে দেখা করতে বেরুনোর আগে থেকে এবং তার পরে নিজের অসহায়তা বোধে আচ্ছন্ন হতে হতে সে যেন ক্রমশ নতুন করে চিনতে লাগল নিজেকে—নিজের মন ও শরীরকে। খুব পরিচিত গানের ভুলে যাওয়া কথাগুলোকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টার মতো অদ্ভুত আর্তি ও আকাঙ্ক্ষায় সে যেন পৌঁছে গেল ব্যক্তিগত সময়-শূন্যতায়, যেখানে মাঝখানের এই কয়েকটা বছরের স্মৃতি ও সম্পর্কের দাম নেই কোনো, বাস্তব জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে কল্পনাকে, এক অক্ষতযোনি যুবতীর স্বপ্ন যেখানে নিজের ইচ্ছেমতো ভরে তুলতে পারে নিজেকে। আশরীর আবেগের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করার মধ্যে যে এত আনন্দ, এতটাই পূর্ণতা, যেন এর আগে কখনো তা অনুভব করেনি সে।

মাঝেমধ্যের এই দেখা এবং একসঙ্গে অনেকটা সময় কাটানোর পর যেমন হয়, আজও রাত ন'টা নাগাদ বাড়ির অদূরে অন্তরাকে পৌঁছে দিতে অভিরূপ যখন গাড়ি থামাল, তখন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল অন্তরা।

এর আগেই সে সম্বোধন পাল্টেছে, অভিরূপের পাশ থেকে নেমে যেতে যেতেও না-নেমে হঠাৎ বলল, 'যদি আজ না ফিরি—যদি আবার তোমার ফ্ল্যাটেই ফিরে যেতে চাই, নিয়ে যাবে না ?'

অভিরূপ হাসল। প্রশ্নটার অর্থ বুঝে স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে অন্তরার পিঠে আলতো স্পর্শ রেখে বলল, 'আমি যা পারব, তুমিও তা পারবে কেন !'

'পারব।' গলায় নিঃশ্বাস মিশিয়ে অন্তরা বলল, 'আজ আমার ফিরতে ইচ্ছে করছে না।'

'তবু—', বলার কথাটা খুঁজে পেতে সময় নিল অভিরূপ, হাল্কা ধরনে বলল, 'সব খেলারই একটা নিয়ম থাকে—তোমার ক্রিকেটার স্বামী সেটা বোঝে। আমাদেরও বুঝতে হবে তো !'

'যাকে ভুলে যাবার জন্যে সব দিয়েছি তোমাকে, তার কথা আবার মনে পড়িয়ে দিচ্ছ কেন !' পিঠ থেকে অভিরূপের হাতটা টেনে এনে

ঘ্রাণ নিল অন্তরা, চোখ তুলে বলল, 'নাকি এখনো আগের ভুলের শোধ নিচ্ছ!'

'তুমিও জানো তা নয়। কিন্তু—', অভিরূপ বলল, 'কৌশিক এলে বলো ওকে। আমি তিন বছর অপেক্ষা করেছি, তুমি আর ক'টা দিন অপেক্ষা করতে পারবে না কেন! ওর কথাটাও শোনা দরকার— হয়তো ও-ও চাইবে—'

'আজ রাতে ঘুমোতে পারব না।' অন্তরা কিছু ভাবল যেন। কয়েক মুহূর্ত মুখ নিচু করে থেকে বলল, 'যাচ্ছি—'

'কাল—?'

অন্ধকারে মাথা নাড়ল অন্তরা। গাড়ি থেকে নেমে যেতে যেতে বলল, 'তুমি ফ্ল্যাটেই থেকো।'

'ফোন করব?'

'হ্যাঁ।'

আলোছায়ার মধ্যে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে যেতে গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ শুনে অন্তরা বুঝল অভিরূপ ফিরে যাচ্ছে। সন্ধের পর থেকে এদিকটা এমনিতেই নির্জন হয়ে আসে। আজ যেন একটু বেশিই নির্জন। পাশ দিয়ে একটা গাড়ি চলে যাবার পর লক্ষ করল খানিকটা এগিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দুজন পুরুষ এবং এক মহিলা। উল্টোদিক থেকে জোর পায়ে এগিয়ে আসছে দুজন মহিলা, ওরা আরো একটু কাছে আসতে মনে হলো আশপাশের বাড়িগুলোর কাজের লোক। প্রায় গা ঘেঁষে শিস্ দিতে দিতে চলে গেল এক সাইকেলচড়া যুবক। শর্ট-কাটের রাস্তা না ধরে উল্টোদিকের রাস্তা ধরলে হয়তো আরো লোকজন, ব্যস্ততা ও আলো চোখে পড়ত। ইত্যাদি ভেবে প্রায় আহ্লাদে অন্তরা ভাবল, বাইরে থেকে বোঝা যাবে না, কিন্তু শরীরের ভিতরে এখনো সে অনুভব করছে বহুবর্ণ আলোর বিচ্ছুরণ। আজ রাতে ওই আলোই তাকে জাগিয়ে রাখবে। ঘুমোতে পারবে না, অভিরূপকে কি সে বলেছিল?

লিফ্‌টের অস্বচ্ছ আয়নায় নিজেকে দেখে নিল অন্তরা, কপালের ওপর নেমে আসা চুলের গোছাটা সরিয়ে দিল জায়গায়। অভিরূপের ফ্ল্যাটে থেকে বেরুবার আগেই দেখে নিয়েছিল টিপটা ঠিক জায়গায়

আছে কি না। না, এখন তাকে দেখে কেউই বুঝবে না বিকেলে যেভাবে গিয়েছিল, ফিরছে তার চেয়ে অন্যরকম হয়ে। তবু, কলিং বেলের দিকে হাত বাড়ানোর আগে শালটা ঠিকঠাক গায়ে জড়িয়ে নিল সে।

দরজা শৌভিকই খুলল। সামান্য থমথমে মুখ।

'দেরি করলে!'

'দেরি!' হাতের ঘড়িতে চকিতে চোখ বুলিয়ে অন্তরা বলল, মিনিট কুড়ি। বাব্বা, বাস যেন আসছিলই না!'

এভাবে বললেও শৌভিকের ভাবান্তর হলো না। যেমন হয়, ধারে কাছে কনককে দেখল না; নিশ্চয়ই নিজের ঘরে। ন'টার পর পুষ্পরও থাকার কথা নয়।

শৌভিক দরজা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়াতে ওকে সহজ করার জন্যে ইচ্ছে করেই হাত বাড়িয়ে ওর নাকটা নেড়ে দিয়ে অন্তরা বলল, 'এত গম্ভীর কেন! বৌদির জন্যে চিন্তা, নাকি অনেকক্ষণ চা পাওনি!'

'পুষ্প চা করে রেখেছে—'

মুখের ভাবে পরিবর্তন হলেও শৌভিক যে চিন্তিত তা চোখ এড়ালো না অন্তরার। হতে পারে এই মুহূর্তে দাদার ছায়া ভর করেছে ওর ওপর। গা না করে নিজের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে জিজ্ঞেস করল, 'খেলার খবর কি?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেল না। পিছনে তাকিয়ে অন্তরা দেখল, নিজের ঘরে যাবার মুখে দাঁড়িয়ে আছে শৌভিক। তফাৎ এইটুকু, নখ, কাটছে দাঁতে। ওখান থেকেই বলল, 'দুশো আটত্রিশ, আট উইকেটে—'

'তাহলে টিঁকে আছে এখনো!' অন্তরা এবার ঘরে ঢুকবে পর্দাটা সরাতে গিয়েও থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমার দাদার খবর পেয়েছ?'

'নাইন্টি এইট—নট আউট—'

'বলো কি! আর দু'রান হলেই তো সেঞ্চুরি!'

শৌভিক জবাব দিল না। তারপর হঠাৎই ব্যস্ত হয়ে বলল, 'তুমি

হাত মুখ ধুয়ে নাও। আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি—'

ছেলেটা মাঝে মাঝে হেঁয়ালি করে স্বাভাবিকের চেয়ে অন্যরকম হয়ে যায়। যেমন এখন, সকালে যেমন দেখেছিল তার চেয়ে অনেকটা আলাদা, ভাব বদলে গেছে মুখচোখের। বলেছিল কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাবে টালিগঞ্জ না কোথায়। বন্ধু, না বান্ধবী? প্রেম-ট্রেম করছে না তো! ইদানীং আগের চেয়ে ঘনঘন কলকাতায় আসছে। এবারেও এসেছে হঠাৎই। হতে পারে, বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করার পর বাড়িই ফিরেছে গম্ভীর হয়ে—রাগ বা মন খারাপ, যা হোক কিছু হতে পারে, তারই জের টানছে এখনো।

দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল অন্তরা। বিছানার ওপর শালটা ছুঁড়ে দিয়ে নিশ্বাস নিল জোরে। সম্পর্কটা কার সঙ্গে কার! ভাবল, এই যে সে শৌভিককে নিয়ে ভাবছে, কিংবা দেরী হওয়ার জন্যে প্রশ্ন করল শৌভিক—সবই তো সে কৌশিকের স্ত্রী বলেই! আর ক'দিন পরে যখন সে কৌশিকের স্ত্রী থাকবে না, ক্রমশ অভিরূপের স্ত্রী হয়ে যাবে, তখন কেমন সম্পর্ক হবে শৌভিকের সঙ্গে? হয়তো আর দেখা হবে না; বা হলেও হয়তো এড়িয়ে যাবে দুজনেই। কৌশিককে বিয়ে করার পর গোড়ার দিকে যেমন হয়েছিল নন্দার সঙ্গে। পরে অবশ্য নন্দাই সহজ করে নেয় পুরনো বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সবাই নন্দা নয়।

কিন্তু, এখন সে এসব ভাববে কেন! আটানব্বই নট আউট দাঁড়িয়ে আছে কৌশিক, এখনো দুটো উইকেট হাতে আছে, কাল হয়তো সত্যি-সত্যিই সেঞ্চুরি করে ফেলবে। তার কাছে কি সত্যিই কোনো দাম আছে এই সেঞ্চুরির! অভিজ্ঞতা শেষ হয়ে যাবার পর আর শুরু হয় না; ভালোবাসা, শরীর একজনকেই দেওয়া যায়। নিজের অনাবৃত শরীরের হঠাৎ জেগে-ওঠা রোমাঞ্চ অনুভব করতে করতে অন্তরা ভাবল, কাল নিশ্চয়ই সে অভিরূপকে বলতে পারবে না কৌশিক সেঞ্চুরি করেছে, সুতরাং—। না, আজকের অভিজ্ঞতার পর আর তা সম্ভব নয়।

আবার তৈরী হয়ে রান্নাঘরে গেল অন্তরা। শৌভিককে দেখছে না, নিশ্চয়ই নিজের ঘরে ঢুকেছে। রাতে ও দেরি করে খায়; সেও বসবে,

ওর সঙ্গে। তার আগে খেতে দিতে হবে কনককে। ফ্লাস্ক থেকে দু'টি কাপে চা ঢালতে ঢালতে সামান্য কৌতুক খেলে গেল অন্তরার বুকে। অভিরূপের কাছে গেলে শুধু অভিরূপই থাকবে, শাশুড়ী, দেওর থাকবে না। দায়িত্বের ভার কমে যাবে অনেকটা। চাকরির চেষ্টা করছে, ইতিমধ্যে সে যদি পেয়ে যায় যে-কোনো চাকরি, তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে নতুন ছাঁচে ঢালতে পারে নিজেকে। যেখানে স্বাধীনতা আছে, স্বাচ্ছন্দ্য আছে, নেই অপমানবোধ।

দু' হাতে দু' কাপ চা নিয়ে শৌভিকের ঘরে ঢুকল অন্তরা।

কপালে একটা হাত রেখে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে শুয়েছিল শৌভিক। ওকে দেখে উঠে বসল।

টেবিলের ওপর একটা কাপ নামিয়ে রেখে অন্তরা বলল, 'খেয়ে দেখুন মশাই, গাম্ভীর্য কমে কিনা!'

শৌভিক জবাব দিল না। হাসল না। কেমন শূন্য দৃষ্টিতে ক'মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুমি বোসো বৌদি। কথা আছে!'

এটা অন্তরার থেমে যাবার সময়। হঠাৎই তার মনে হলো কোথাও কিছু একটা ঘটেছে, সে যার কিছুই জানে না। নিজের চায়ের কাপটাও সে তাড়াহুড়ো করে নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর।

'খবরটা খারাপ, বৌদি—'

'কী হয়েছে!'

শৌভিক সময় নিল। তারপর বলল, 'দাদার একটা বড় হেড ইনজুরি হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে গেছে—'

অন্তরা স্তম্ভিত। কথা ফুটল না মুখে।

'আটটা নাগাদ একটা ফোন এসেছিল। ওদের ম্যানেজার বলল, লাস্ট ওভারে বল লেগেছিল মাথার পেছনে। পড়ে যায়—'

'কী বলছ এসব!'

'হ্যাঁ।' শৌভিক ঠোঁট কামড়াচ্ছে। থেমে থেমে বলল, 'তুমি আসার একটু আগে স্নেহাশিসদাও ফোন করেছিল। বলল, নব্বইয়ের কোঠায় গিয়ে কেমন ডেসপারেট হয়ে গিয়েছিল, অন্ধের মতো ব্যাট চালাচ্ছিল—ওভাবে কেউ খেলে না। আটানব্বইয়ে পেঁাছে বাউন্সার সামলাতে পারেনি—'

বলতে বলতে থেমে গেল শৌভিক। তারপর হঠাৎই ভেঙে পড়ে বলল, 'কোমা হয়ে গেছে, বৌদি। হয়তো—'

অন্তরা দেখল, পিঠ কাঁপিয়ে আর নিঃশব্দে শৌভিক এখন সেই-ভাবেই কাঁদছে, এই অবস্থায় দাদার ছোট ভাই যেভাবে কাঁদে। কিন্তু, সে কী করবে? কৌশিক কি তার স্বামী নয়, অন্তত এখনো পর্যন্ত! একটু আগেও ভবিষ্যতের যে-চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল সে, এখন মনে হচ্ছে সেটাও থমকে গেছে ওই আটানব্বইয়ে পৌঁছে—আর এগোবে না।

কিছুই করল না অন্তরা। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে নিজের ঘরে ঢুকলো। আলো নিবিয়ে দরজা খুলে অন্ধকার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল।

কোনো বোধ, কোনো অভিজ্ঞতার অনুভবই এখন আর স্পর্শ করছে না তাকে। স্মৃতিও না। সেই সময়ের সেই মুহূর্তগুলোর অর্থহীনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সে শুধু ভাবল, স্নেহাশিস বলেছে নব্বইয়ের কোঠায় পৌঁছে অদ্ভুত বেপরোয়া হয়ে অন্ধের মতো ব্যাট চালাতে শুরু করেছিল কৌশিক, যেন ওই সেঞ্চুরিটা না পেলেই মৃত্যু! দল তো হেরেই যাচ্ছে, তাহলে ওইভাবে কাকে বাঁচাতে চেয়েছিল সে! নিজেকে? নাকি অন্তরাকে? নাকি তাদের প্রায় ভেঙে যাওয়া সম্পর্কটাকে?

অন্তরা নিজেও অন্ধ হয়ে গেল।